॥ নিবেদন ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব রসময়—তিনি অমৃতরসিক। তিনি সর্বব্যাপী পরমতম আনন্দের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের অন্তরে—রসাশ্রিত গল্প, উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে। সেগুলো থেকে কিছু কিছু চয়ন করে নিয়ে নিবেদন করলাম সামান্য এই পুস্তকখানি, 'অমৃতরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ'। ব্রহ্মরসপিপাসু পাঠক এই পুস্তকখানি পড়ে সামান্যতম তৃপ্তি পেলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আমি অকিঞ্চন—অক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রসাশ্রিত তত্ত্বকথা আলোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। তবুও, 'মরা, মরা' বলে যদি কোনদিন 'রামনাম' জপ করতে পারি তাহলেই আমার জীবন মধুময় হয়ে উঠবে।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ!

নিবেদক

খোয়াই ॥ ত্রিপুরা রাজ্য ॥

পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী

এই লেখকের লেখা

রক্তে রাঙা জালিয়ানওয়ালাবাগ
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ
লোকমাতা সারদা

॥ এক ॥

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন এবং মানুষের আত্মিক কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলে অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুবিদিত। এই দেশের মাটিতে বিভিন্ন যুগে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিকশিত করে তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, রামানুজ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং এরকম আরও অনেক মহাপুরুষ। মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে গীতায় উল্লেখিত হয়েছে :

> "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্মের নিন্দা এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি আপনার স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুর্বৃত্তদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

জীবের কল্যাণের জন্য সর্বব্যাপী ভগবান ধরাধামে অবতরণ করেন এবং অলৌকিক শক্তি নিয়ে মহামানবরূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বর যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করে ধরাধামে আসেন, সংসারের মায়ামুগ্ধ মানুষ তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না এবং তাঁকে সাধারণ মানুষ ভেবে অনেক সময় অবজ্ঞা করে। স্বয়ং ভগবান যখন মানবদেহ ধারণ করে ধরাধামে নেমে আসেন, তখন বহু ভক্ত ও সাধক সেই দেবমানবের দিব্যজীবন অনুধ্যান করে নিজেদের জীবনকেও পবিত্র ও সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন।

তেমনি মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বররূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ত্যলোকে আবির্ভাব।

তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ প্রজ্ঞা নিয়ে আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরলেন ধর্মের সহজ পথ। অপূর্ব ব্যঞ্জনার ভাবরসের সৃষ্টি করে মানব-জমিনে তিনি করলেন মননের চাষ। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "যত মত, তত পথ।" ধর্মের এর চেয়ে অমৃতময় সহজ ব্যাখ্যা আর কি করে হতে পারে?

বিল্বমঙ্গল কাব্যে আছে:

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং
বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো মধুরং মধুরং
মধুরং মধুরং॥

রসময় শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একথা উল্লেখ করা হলেও, আমরা বলবো, মধুর চেয়ে মধুরতর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ, মধুর সৌরভ তাঁর মনে, প্রাণে। তিনি অনবদ্য—অনন্ত। তিনি অমৃতরসের রসিক—তিনি রসময়। তাঁর মধুময় জীবন এক অত্যাশ্চর্য লীলায় ভরপুর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত অমৃতরস পান করে কত পাপী তাপীর জীবন হয়েছে সুপবিত্র—তারা পেয়েছে জীবনের আলোকবর্তিকা, জেনেছে বাঁচবার পথনির্দেশ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই রসিক। তিনি ব্রহ্মরসবিবেত্তা। যিনি সত্যিকারের রসিক তিনিই তো ব্রহ্মরস আস্বাদন করতে পারেন। তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবতারিণীর কাছে আকুল আর্তি. 'আমাকে রসেবশে রাখিস মা। আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও প্রজ্ঞাময় 'রসিক' হতে চেয়েছিলেন।

পূর্ণব্রহ্ম যখন নরলীলা করেন, যে উদ্দেশ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেই রূপেই আচরণ করে থাকেন। লীলা বিগ্রহ ধারণ করে মায়ার আবরণে নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখেন। তিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন। ইনিই সেই সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ—তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। এ বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মার মনেও একবার সংশয় দেখা দিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মাঠে মাঠে গরু চরাচ্ছেন, রৌদ্রে কাতর হয়ে গাছতলায় বিশ্রাম গ্রহণ করছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখাল বালকদের কাঁধে নিয়ে ধেই ধেই করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার তিনি মাঝে

মাঝে কাদায় আছাড় খেয়ে লুটোপাটি খাচ্ছেন, কখনো চুরি করে ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে পড়ছেন। ইনিই কি করে পূর্ণব্রহ্ম গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হলেন?

ব্রহ্মার মনে সংশয়। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্য একদিন চুপি চুপি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সামগ্রী বাছুর, বেণু, যষ্টি ইত্যাদি এনে এক পর্বতের গুহায় লুকিয়ে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান! তাই ব্রহ্মার অভিসন্ধি বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না। তিনি যথারীতি তাঁর লীলার সামগ্রী নিয়ে লীলা করে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পর আবার ব্রহ্মা এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, শ্রীকৃষ্ণ আগের মতই বাছুর, বেণু, যষ্টি ইত্যাদি নিয়ে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে রাখাল বালকদের সাথে ক্রীড়ায় মত্ত। ব্রহ্মা এলেন পর্বতগুহায়। এসে দেখলেন যে, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, যেমনটি তিনি রেখেছিলেন। আর কালবিলম্ব না করে ব্রহ্মা চলে এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়ে স্তব করতে লাগলেন, "প্রভো! আমার অপরাধ মার্জনা করো! তুমিই ধন্য! ধন্য ব্রজবাসিগণ, এই ব্রজের বৃক্ষলতাও ধন্য।"

ভগবানের নরলীলা তাঁর কৃপা না হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও বুঝবার উপায় নেই। এ সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিজেই বললেন, "নরলীলায় অবতারকে ঠিক ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, তাই তাঁকে চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক একেবারে মানুষের মত। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। একটা অপূর্ব রসাশ্রিত উদাহরণ দিয়ে তিনি আমাদের মনের সংশয় দূরীভূত করলেন। বললেন, "থিয়েটারে যে সাধু সাজে, সে ঠিক সাধুর মত আচরণ করে। একজন বহুরূপী সেজেছে—ত্যাগী সাধু। সাজটি ঠিক ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা তাকে একটি টাকা দিতে গেল। কিন্তু সে নিলো না। 'উঁহু' বলে সে চলে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, তখন বললো, 'টাকা দাও।' বাবুরা বললো, 'তুমি টাকা নেবে না বলে চলে গেলে. তবে টাকা চাইছো কেন?' লোকটি বললো, 'তখন সাধু সেজেছিলাম, তাই সে সময়ে টাকা নিতে নেই।"

তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষের রূপ ধরে আসেন, তখন ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরদেহ ধারণ করে লীলা করে গেছেন আর আপামর

জনসাধারণকে তিনি আলো দেখিয়েছেন অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটায়। তাঁর মাহাত্ম্য কে বুঝতে পারে? তিনি নরদেহ ধারণ করেছিলেন অমৃতময় লোকশিক্ষা দেবার জন্য। আমাদের দেশে যুগে যুগে বহু মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা মানুষের আত্মিক কল্যাণের জন্য অনেক সদুপদেশ দিয়ে গেছেন এবং বাণী প্রচার করে গেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে সমস্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে। রামকৃষ্ণদেব সহজ সরল কথায় ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু সহজ সরল ব্যাখ্যাই দেননি, কথায় কথায় অপূর্ব রস পরিবেশন করে তাঁর বক্তব্য বিষয় মধুময় করে তুলেছেন। বলার ভঙ্গিতে সে গুলো সত্যিই অনন্য—অসাধারণ। তিনি রসাশ্রিত প্রাণশক্তি দিয়ে সবাইকেই অন্তরের কাছে টেনে নিয়েছেন। তাঁর অমৃতময় বাণী প্রেম-প্রস্রবণের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। রামকৃষ্ণদেব যথার্থই ভাষার জাদুকর। তিনি আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যিক না হলেও, অন্তরে কবি ও শিল্পী। ঝর্ণাধারার মত শত সহস্র সরল উপমা ও রসাশ্রিত গল্পের মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন ধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। সামান্য গল্পকে, উপমাকে কি অভূতপূর্ব অসামান্যতায় পরিণত করে তিনি অমৃতকথনের রসভাণ্ডার তুলে ধরেছিলেন ভক্তমণ্ডলীর কাছে। সেই রসময় রসিক রামকৃষ্ণদেবের সরল গল্প ও উপমা থেকে কিছু কিছু চয়ন করে নিয়ে আমরা অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় তত্ত্বগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু অমৃতরস আস্বাদন করতে পারি।

॥ দুই ॥

মানুষ বুদ্ধিজীবী। জ্ঞান লাভের ভিতর দিয়েই মানুষের বুদ্ধির পরিতৃপ্তি সাধন ঘটে থাকে। তাই মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা। কোন এক সুদূরের আহ্বান যেন মানুষের চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা—কিভাবে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। ঈশ্বর কিংবা জগৎস্রষ্টা বলে কেউ আছেন কি? যদি থেকে থাকেন তবে আমরা কিভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করবো? জীবের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক—আমরা কিভাবে তা জানতে পারবো? মানুষ স্বরূপতঃ কি? যাঁরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি, কেবলমাত্র তাঁরাই এসব জটিল প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিতে সমর্থ। আধুনিক যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষিই নন--তিনি একজন যুগ অবতার। সহজ সরল সরস কথার ভিতর দিয়ে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন উপায় বলে গেছেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের সন্দিগ্ধ মন যুগে যুগেই নাড়া দিয়েছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান জড় জগতের বাইরের বিষয় নিয়ে কতটুকু সার্থক গবেষণা করতে পেরেছে? জড় জগৎই কি একমাত্র সত্য বস্তু? বিভিন্ন অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকের মতে জড় জগতের ঊর্ধ্বে যে এক চৈতন্যময় সত্তা বা পরমাত্মা আছেন তাঁকে জানাই হচ্ছে জীবনের চরম চরিতার্থতা। কিন্তু তাঁকে আমরা জানবো কি করে? 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা।' যুগে যুগে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য প্রমুখ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা আর আধুনিক যুগে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু ভাষার লালিত্যে, বলার ভঙ্গীতে, দুরূহকে সহজ করার ক্ষমতায় রামকৃষ্ণদেব অদ্বিতীয়—একক—অনন্য। আমরা বলি উপমা কালিদাসস্য। কিন্তু আধুনিক যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত এত সুন্দর উপমা আর কেউ দিতে পারেন নি। যে-কেউ যত কঠিন প্রশ্ন নিয়েই এসেছে, সেই পরম-পুরুষের কাছে হয়ে গেছে সে প্রশ্নের সহজ সরল সমাধান। আত্মতৃপ্তিতে প্রশ্ন-কর্তার মন হয়ে উঠেছে ভরপুর।

পরমব্রহ্ম কে জানতে হলে প্রথমেই চাই বিশ্বাস। কথায় আছে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।' ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মনেও প্রথমে সন্দেহ জেগেছিল। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পষ্ট জবাব, "হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ করেছি। তোমাকে যেরকম প্রত্যক্ষ করছি, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি—ঈশ্বরের সঙ্গেও আমার ঠিক তেমনি কথাবার্তা হয়ে থাকে। তুমি চাইলে, তোমাকেও দেখাতে পারি।"

তত্ত্ব জিজ্ঞাসার এমন সহজ সরল জবাব আর-কে দিতে পারেন? কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই চাই ঐকান্তিক বিশ্বাস। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ—যার যেরূপ বিশ্বাস সে সেইরূপেই হয়ে থাকে। আত্মা সম্পর্কে, জগৎ ও জগৎকারণ সম্পর্কে মানুষের যেরূপ বিশ্বাস সে সেইরূপই উপলব্ধি করে থাকে।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। আমরা রামায়ণে দেখতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, লঙ্কায় যেতে সমুদ্রের উপর তাঁর সেতু বাঁধতে হয়েছিল। কিন্তু সামান্য হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে এক লাফে সমুদ্র অতিক্রম করে চলে গেল।"

বিশ্বাসের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব সুন্দর এক রসস্নিগ্ধ গল্প বললেন। —"বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে ঐ পাতাটি একজন লোকের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলেন। সেই লোকটি সমুদ্রের ওপারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই, তুমি বিশ্বাস রেখে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো, যেই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে মরবে।'

"লোকটি সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিলো, এমন সময় তার খুব ইচ্ছা হলো যে, কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা আছে তা একবার দেখে। খুলে দেখে যে, বিশেষ কিছুই নেই, শুধু রামনাম লেখা আছে। অমনি এলো অবিশ্বাস। 'শুধু এই রামনামের জোরে আমি সমুদ্র পার হতে পারবো?' যেই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে মরলো।"

ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে হলে ঈশ্বর সম্পর্কেও চাই বিশ্বাস।

আমি ঈশ্বরের নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? ঈশ্বরের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। আবার সরস উদাহরণ দিয়ে সহজ করে দিলেন রামকৃষ্ণদেব।

"কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে করতে একদিন তার খুব জল তেষ্টা পেলো। সে একটা কুয়োর কাছে গিয়ে দেখলো, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাকে বললো, 'ওরে তুই কি জাত? আমাকে এক ঘটি জল তুলে দিতে পারিস?'

"লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বললো, 'ঠাকুর মশাই। আমি হীন জাত, মুচি।'"

"কৃষ্ণকিশোর বললো, 'তুই বল, শিব।'"

"মুচি বললো, 'শিব!' শিব বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণকিশোর বললো, 'নে, এবার জল তুলে দে।'"

চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাহলেই আমার দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যাবে।

"যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসহারা পায়"—বললেন রামকৃষ্ণদেব, "মুখে রাম-নাম বললে কি হবে, চাই আন্তরিক বিশ্বাস। বলতে হবে, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। তুমি সেব্য আর আমি অকিঞ্চন। তাই তোমার কৃপাতেই আমি এ ভব নদী পার হতে সমর্থ হবো।"

রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর গল্প গাঁথলেন চমকপ্রদ ব্যঞ্জনায়।

"এক গয়লানীর নদী পার হয়ে দুধ যোগাতে হয়। একদিন চারিদিক অন্ধকার

করে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। দুর্যোগের জন্য সে পারাপারের নৌকো পেলো না। গয়লানী ভাবলো, 'রামনামে ভব সমুদ্র পার হওয়া যায়, আর আমি এই নদীটা পার হতে পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো।' অমনি এলো আত্মবিশ্বাস। রামনাম করতে করতে সহজেই নদী পার হয়ে গেল গয়লানী।

"গয়লানী যে বাড়িতে দুধ দেয়, সে বাড়ির মালিক এক মস্ত পণ্ডিত। তিনি তো গয়লানীকে দেখে একেবারে অবাক! এই দুর্যোগে সে কি করে নদী পার হয়ে চলে এসেছে। নদীর ওপারে কি কাজ ছিল পণ্ডিতের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও রামনাম করে নদী পার হয়ে যেতে পারবো?'

"'কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে'—বললে গয়লানী।

"দুজনেই এলো নদীর ধারে। গয়লানী রামনাম করে অতি সহজেই নদী পেরিয়ে যেতে লাগলো। আর পণ্ডিতও রামনাম করে এগোতে লাগলেন আর কাপড় ভিজে যাবে আশঙ্কায় কাপড় গুটাতে লাগলেন।

"পণ্ডিতের অবস্থা দেখে গয়লানী বললো, 'ঠাকুর, রামনামও করবে আবার কাপড় সামলাবে—এতো হতে পারে না।'

"পণ্ডিত পড়ে রইলো পিছনে। নদী পার হওয়া আর হলো না।"

চাই ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস। যে বিশ্বাসে ভরসা করে হনুমান এক লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হতে পেরেছিল। এরমধ্যে দ্বিধা বা সঙ্কোচের কোন স্থান নেই, স্থান নেই কোন প্রকার বিচারের।

॥ তিন ॥

"বাপ ছেলেকে বর্ণ পরিচয় শেখাচ্ছে"—বললেন রামকৃষ্ণদেব। "বাপ বলছে,—'অ'। ছেলে তর্ক করছে, কেন বলবো 'অ'? 'লেখা-পড়া শিখতে হলে প্রথমে 'অ' বলতে হয়। বল, 'অ'। ছেলে বলছে, 'বুঝিয়ে দাও, কেন বলবো 'অ'।' আমি বলবো, 'দ'। কী যুক্তি আছে বাপের? শেষে অনন্যোপায় হয়ে বাপ বললো, 'যুগ যুগ ধরে সবাই 'অ' বলে এসেছে। তুমিও 'অ' বল। অর্থাৎ তুমিও মেনে নাও। বর্ণ পরিচয় 'অ' থেকে শুরু। তেমনি জগৎ পরিচয়ের আদিতে রয়েছেন ঈশ্বর।" এটা মেনে নিতে হয়। এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। এতে কোনরূপ অবিশ্বাস থাকলে সৃষ্টি রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করা কি করে সম্ভব হবে?

আবার রসালো গল্প জুড়লেন রামকৃষ্ণদেব। বিশ্বাসের গল্প—সরলতার গল্প।

"এক সাধুর কাছে গিয়ে একজন লোক উপদেশ চাইলো। সাধু বললো, 'ঈশ্বরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসো।'

"লোকটি বললো, 'ভগবানকে তো কখনো দেখিনি, তাঁর বিষয় তো কিছুই জানি না, তবে কি করে তাঁকে ভালবাসবো?'

"সাধু জিজ্ঞেস করলো, 'এ সংসারে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসো কাকে?'

"লোকটি জানালো যে, এ সংসারে আপনার বলতে তার কেউ নেই। তবে তার একটি ভেড়া আছে।

"সাধু বললো, 'এই ভেড়ার মধ্যেই নারায়ণ আছেন জেনে ভেড়াটিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসো আর সেবা করো।'

"সাধু চলে গেলেন।

"সাধুর কথায় লোকটির বিশ্বাস হলো। সে মন-প্রাণ দিয়ে ভেড়ার সেবা শুরু করে দিলো। বহুদিন পর আবার সেই সাধুর সঙ্গে লোকটির দেখা হলো।

"সাধু জিজ্ঞেস করলো, 'কি হে, কেমন আছো?'

"লোকটি প্রণাম করে বললো। 'ঠাকুর! আমি এখন ভেড়ার মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর মূর্তি দেখতে পাই। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁকে দর্শন করে আমি পরমানন্দে বাস করছি।"

ঈশ্বর যে আছেন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্বত্রই যে ঈশ্বর বিরাজিত—এ বিশ্বাস না এলে আমরা কি করে ঈশ্বর দর্শন করবো?

বিশ্বাসের আরেক অপূর্ব সুন্দর গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"খুব অল্প বয়সে একটি মেয়ে বিধবা হয়েছে। সে স্বামীর চেহারা মনে করতে পারে না। অন্য মেয়েদের স্বামী আসে যায়। অথচ এই মেয়েটির স্বামী আসে না। মেয়েটির মনে কত দুঃখ। একদিন সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, আমার স্বামী কোথায়?'

"বাবা আর কি বলেন? তিনি মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমার স্বামী হচ্ছেন গোবিন্দ'। তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকলেই তিনি এসে দেখা দেবেন।'

"বাবার কথাতেই ছোট্ট মেয়েটির বিশ্বাস হলো। সে বিশ্বাস অটল বিশ্বাস তাতে কোন খাদ নেই।

"ঘরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটি অঝোরে কাঁদতে লাগলো। আন্তরিকভাবে ডাকতে লাগলো গোবিন্দকে। 'গোবিন্দ! কোথা তুমি? তুমি এসে আমাকে একবারটি দেখা দাও।'

"মেয়েটির সরল কান্নায় ঠাকুর আর লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। সত্যি সত্যি ভগবান গোবিন্দ এসে দেখা দিলেন।"

গল্পের রাজা রামকৃষ্ণদেব। সরস ভঙ্গীতে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলেছেন তিনি। ঈশ্বর লাভের জন্য চাই একাগ্রতা। সেই একাগ্রতার গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব কি সুন্দর করে।

"এক দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। একজন চাষার খুব রোক। সে স্থির করলো, খাল কেটে নদী থেকে জল নিয়ে আসবে তার ক্ষেতে। সে প্রতিজ্ঞা করলো, যতক্ষণ জল না আসে তার ক্ষেতে ততক্ষণ সে খাল কেটে যাবে। আরম্ভ করলো কাজ। কিন্তু বড় পরিশ্রমের কাজ। ধীরে ধীরে বেলা হলো—স্নান করবার সময় হলো। বৌ তার মেয়ের হাত দিয়ে তেল পাঠিয়ে দিল মাঠে।

"মেয়েটি বললো, 'বাবা, অনেক বেলা হয়েছে। তেল মেখে এবার নেয়ে এসো।'

"চাষী বললো, 'তুই এখন যা। আমার অনেক কাজ।'

"বেলা গড়িয়ে গেল—তবুও চাষীটির কাজ শেষ হয় না। স্নান করার নামটি পর্যন্ত নেই। তার বৌ তখন হন্তদন্ত হয়ে মাঠে এসে হাজির হলো। বললো চাষীকে, 'এখনও নাওনি কেন? ভাত যে জুড়িয়ে জল। তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। বাকী কাজ কাল করবে। এখন চান করে খেতে চলো।'

"এই কথা শুনে কোদাল হাতে করে চাষা তার বৌকে তাড়া করলো। বললো, 'তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয়নি। চাষ-বাস কিছুই হলো না। এবার ছেলেপুলে খাবে কি? না খেয়ে তো সব মারা যাবে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনবো তবে নাওয়া খাওয়ার কথা বলবো।'

"গতিক সুবিধের নয় দেখে পালিয়ে গেল বৌ। চাষা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় নদী থেকে ক্ষেতে জল নিয়ে এলো। একদিকে বসে দেখতে লাগলো নদীর জল কুলকুল করে আসছে। তখন তার মন আনন্দে ভরে উঠলো। বাড়ি গিয়ে সে স্ত্রীকে ডেকে বললো, 'নে এখন তেল দে আর এক ছিলিম তামাক সাজ।' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে—নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমতে লাগলো।"

কি অপূর্ব রসস্নিগ্ধ গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব! অথচ কি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ! ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে চাই এই রকম চাষার মত রোক।

একের পর এক গল্প। চিত্রকল্পের উপর চিত্রকল্প। ঈশ্বর লাভের জন্য আরেকটি একাগ্রতার আশ্চর্য গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"এক জনের পরিবার বললে, 'তুমি কোন কাজের নও। বয়স বাড়ছে, এখনো তুমি আমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারো না। কিন্তু অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য। তার ষোলজন পত্নী—এক একজন করে ত্যাগ করছে ক্রমে ক্রমে।'

"স্বামী স্নান করতে যাচ্ছিলো, কাঁধে গামছা। বললো, 'ক্ষেপি, সে লোক কখনো ত্যাগ করতে পারবে না। একটু একটু করে ত্যাগ করা যায়? এই দেখ, আমিই ত্যাগ করতে পারি। আমি চললুম তোদের ত্যাগ করে।'

বাড়িঘর কোনরকম গোছ-গাছ না করে সেই অবস্থাতেই কাঁধে গামছা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল সে লোকটি। বাড়ির দিকে, স্ত্রীর দিকে একবার পেছন ফিরেও তাকালো না।"

ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ করতে হলেও চাই এই রকম ত্যাগ।

॥ চার ॥

ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ করতে হলে চাই ব্যাকুলতা—চাই শিশুর মত সরলতা। চাই ডাকার মত ডাক। সে ডাকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না।

ব্যাকুলতার কি সুন্দর একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণদেব কি সরল ভঙ্গীতে।

তিনি বললেন, "যাত্রায় গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে। তখন কৃষ্ণের কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। সাজগোজ করে আপনমনে বসে বসে তামাক খায় আর গল্পগুজব করে। নারদ যখন ব্যাকুল হয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে আসরে নেমে গান ধরে, 'প্রাণ হে। গোবিন্দ মম জীবন' তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারে না। হুঁকোটা নামিয়ে রেখে আসরে নেমে পড়ে।"

আমরাও 'প্রাণ হে। গোবিন্দ মম জীবন'—ব্যাকুল হয়ে এই গান গেয়ে যাবো।

আবার রামকৃষ্ণদেবের রসস্নিগ্ধ উদাহরণ, "ছেলে ঘুড়ি কিনবে বলে বায়না ধরেছে। তার পয়সা চাই। মায়ের আঁচল ধরে সে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। মায়ের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

"ছেলে যখন বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে, আর উপেক্ষা করা যায় না, মা তখন নানা ওজর আপত্তি তুললেন, বললেন, 'উনি বারণ করে গেছেন।'

"ছেলে শোনে কার কথা? ছেলে তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ধীরে ধীরে কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল।

"মা তখন বলতে বাধ্য হলেন। 'দাঁড়াও, আগে ছেলেটাকে সামলাই।'

"ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা বার করে দিলে পর ছেলেটি শান্ত হলো।"

ছেলের কান্নার কাছে মায়ের হার স্বীকার। ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেটে আমরাও আদায় করবো ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শ। সেজন্য চাই আন্তরিক ব্যাকুলতা। ঈশ্বরের নাম করবো? হবেখন ধীরে সুস্থে। এতে কি কোন কাজ হয়? চাই ঈশ্বরের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। মনে-প্রাণে বলতে হবে, 'আমি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই চাই না।'

আমরা খানিকটা লেখা-পড়া শিখেছি। তাতেই আমাদের কত অহংকার। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন গবেষণা এখনও সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেনি, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের অবিশ্বাস। রামকৃষ্ণদেব সুন্দর এক উদাহরণ দিয়ে আমাদের বিজ্ঞানের অহংকার একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি বললেন, "একজন এসে বললো, 'ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে।'

"যাকে ওকথা বললো, সে ইংরেজী লেখা-পড়া জানা লোক। সে বললো, 'দাঁড়াও, একবার খবরের কাগজখানা দেখে নিই।'

খবরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নেই খবরের কাগজে! তখন সে ব্যক্তি বললো, 'ওহে, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভেঙে পড়ার কথা তো খবরের কাগজে লেখা নেই। ওসব মিছে কথা।'"

ঈশ্বর তত্ত্ব উপলব্ধির ব্যাপার। শাস্ত্র পাঠ করে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানা গেলেও, শুধু শাস্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরলাভ করা যায় না। সেজন্য চাই আন্তরিক বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা। যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়ে কখনো ঈশ্বরলাভ করা যায় না।

ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কি?

রামকৃষ্ণদেব এরকম একটা জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন অতি সহজতম প্রকাশে।

তিনি বললেন, "তোমার বাবা যে অমুক চন্দ্র অমুক—তার প্রমাণ কি? প্রমাণ—বিশ্বাস। মা বলে দিয়েছেন, অমুক তোমার বাবা। তাই বিশ্বাস করেছ। বিশ্বাস করেছ—কারণ, মাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসো।"

নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে? ভবনদী পার হতে জানাই—সত্যিকারের জানা। ঈশ্বরই বস্তু—আর সব অবস্তু।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"লক্ষ্যভেদের সময় দ্রোণাচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ? এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?

"অর্জুন বললেন— না।'

"'আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

"'না।'

"'গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ?'

"'না।'

"'তবে কি দেখতে পাচ্ছ?'

"শুধু পাখির চোখ।'"

"যে শুধু পাখির চোখটি দেখতে পায়, সেই শুধু লক্ষ্য বিঁধতে পারে।

"যে কেবল দেখে ঈশ্বরই বস্তু, আর সবই অবস্তু, সেই চতুর।" আমাদের অন্য খবর জেনে কাজ কি?

যতই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের একাগ্রতা জন্মাবে, ততই বাইরের জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ কমে আসবে। অতুলনীয় রস সৃষ্টি করে অপূর্ব একটি গল্পের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বোঝালেন তত্ত্বটা।

"একজন পুকুরের ধারে বসে মাছ ধরছে। বড়শির ফাতনাটা নড়ে কিনা সে একাগ্রভাবে তাকিয়ে দেখছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়ে উঠলো। মাঝে মাঝে একটু কাতও হতে লাগলো। সে তখন ছিপ হাতে নিয়ে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা মশাই, অমুক বাঁড়ুজ্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

"কোন উত্তর নেই। সেই ব্যক্তিটির নজর তখন ফাতনার দিকে।

"পথিক বার বার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'আরে মশাই, শুনতে পাচ্ছেন? অমুক বাঁড়ুজ্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

"সে ব্যক্তির তখনও হুঁশ নেই। তার হাত কাঁপছে। কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে যেতে লাগলো।

"পথিক বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল। আর সে ব্যক্তিও তখন টান মেরে মাছটাকে পাড়ে তুললো। তারপর

গামছা দিয়ে মুখ মুছে চীৎকার করে পথিককে ডাকতে লাগলো, 'আরে মশাই, শুনছেন ?'

"পথিক ফিরতে চায় না। অনেক ডাকাডাকির পর ফিরলো। এসে বললো, 'কেন মশাই, আবার ডাকাডাকি কেন ?'

"তখন সে বললো, 'আপনি আমাকে যেন কি বলছিলেন ?'

"পথিক বললো, 'তখন এতবার করে জিজ্ঞেস করলুম, আর এখন বলছেন—কি বলছিলেন ?'

"লোকটি বললো, 'তখন যে আমার ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাইনি।'"

ঈশ্বর চিন্তাতেও ঠিক এমনিভাবে নিমগ্ন থাকতে হয়। এইরূপ একাগ্রতা হলেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এমন একাগ্রতা চাই যাতে অন্য কিছু দেখাও যায় না, শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। এমনকি সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে গেলেও টের পাওয়া যায় না। একাগ্রতার কথা ঠাকুর রামকৃষ্ণদের বললেন কি সহজ রসাশ্রিত ভঙ্গীতে। সকলের বোধগম্য করে।

শিশু মাকে দেখার জন্য খুব ব্যাকুল হয়। আমাদেরও চাই সেরকম ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা এলেই ঈশ্বরের কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হবে।

জটিল বালকের উপখ্যান আছে। সেই কাহিনী শুনিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বোঝালেন ব্যাকুলতার কথা—একাগ্রতার কথা।

"জটিল নামে একটি বালক রোজ পাঠশালায় যেতো। কিন্তু একটা গভীর বনের মধ্য দিয়ে তাকে হেঁটে যেতে হতো। তাই তার ভয়। মাকে বলাতে মা বললেন, 'তোর ভয় হলে মধুসূদনকে ডাকবি।'

"ছেলেটি জিজ্ঞসা করলো, 'মা, মধুসূদন কে ?'

"মা আর কি বলেন ? তিনি বললেন, 'মধুসূদন তোর দাদা হয়।'

"বনের ভিতর দিয়ে একেলা যেতে যেতে ছেলেটি যেই ভয় পায়, অমনি চীৎকার করে ডাকে, 'দাদা মধুসূদন, কোথায় তুমি ?'

"কিন্তু কেউ আসে না। তখন ছেলেটি উচ্চস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'কোথায় দাদা মধুসূদন ? তুমি আস। আমার যে বড্ড ভয় করছে !'

"ভক্তের আহ্বানে ভগবান মধুসূদন কি আর থাকতে পারেন ? তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'এই যে আমি এসেছি। তোমার আর ভয় কি ?' এই বলে

বালকটিকে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন আর বললেন, 'তুমি যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তখনই আসবো।'"

একেই বলে বালকের ন্যায় বিশ্বাস। ব্যাকুল হয়ে আমরাও যদি বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকি, তবে নিশ্চয়ই আমরাও তাঁর কৃপালাভে সমর্থ হবো।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাসের আরেকটি মনোরম গল্প বললেন।

"একজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুর সেবা। একদিন কোন কাজ উপলক্ষ্যে তাকে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। তিনি ছোট ছেলেটিকে বলে গেলেন, 'তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিবি, ঠাকুরকে ভাল করে খাওয়াবি।'

"ছেলেটি নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করলো। ঠাকুর কিন্তু নির্জীব অবস্থায় আসনেই বসে রইলেন। কথাও কন না, খানও না। তখন ছেলেটি বারবার বলতে লাগলো, 'ঠাকুর, তোমার জন্যে ভোগ দিয়েছি। এবার উঠে এসে খাও। তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—আর পারি না।'

"ঠাকুর কিন্তু তখনও নিশ্চুপ।

ছেলেটি তখন কান্না শুরু করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, 'ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন। তবে তুমি কেন আমার হাতে খাবে না?'

"ব্যাকুল হয়ে যেই ছেলেটি খানিকক্ষণ কেঁদেছে, অমনি ঠাকুর হাসতে হাসতে স্বরূপে এসে আসনে বসে খেতে লাগলেন।

"ঠাকুরকে খাইয়ে ছেলেটি যখন ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অমনি বাড়ির লোকেরা বললো, 'ভোগ হয়ে গেছে যখন, এবার থালাবাসন সব নামিয়ে রাখ।'

"ছেলেটি বললো, 'হ্যাঁ হয়ে গেছে; ঠাকুর এসে সব খেয়ে গেছেন।'

"বাড়ির লোকেরা বললো, 'সে কিরে!'

"ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বললো, 'কেন ঠাকুর তো সব খেয়ে গেছেন।'

"ঠাকুরঘরে ঢুকে সবার তখন চক্ষু স্থির।"

ঈশ্বরকে জানার পথ জানি না। মন্ত্র জানি না। কিভাবে ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে পারবো?

চাই আন্তরিক বিশ্বাস। চাই তীব্র ব্যাকুলতা।

যে মন্ত্রে তাঁকে তুষ্ট করবো, সে মন্ত্র তিনিই তো শিখিয়ে দেবেন। সেই মন্ত্র জানার জন্যে অহর্নিশ তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাবো ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে।

ঐকান্তিক নিষ্ঠার এক অপূর্ব রসস্নিগ্ধ গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"একজনের বাড়িতে ভারী অসুখ—যায় যায় অবস্থা। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি

বললেন, 'স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল একটি মড়া মানুষের মাথার খুলিতে জমবে, একটা সাপ একটা ব্যাঙকে তাড়া করবে, ব্যাঙটাকে ছোবল মারার সময় যেই ব্যাঙটা লাফ দিয়ে পালাতে যাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার খুলিতে পড়বে। সেই বিষ দিয়ে ঔষধ তৈরি করে যদি খাওয়াতে পার, তবেই সে বাঁচবে।'

"কাজটা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। তবুও যার বাড়িতে অসুখ, সেই ব্যক্তি দিন-ক্ষণ-নক্ষত্র দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো আর ব্যাকুল হয়ে এসব খুঁজতে লাগলো। আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো 'ঠাকুর! তুমি যদি কৃপা করে এসব জুটিয়ে দাও, তবেই আমি পেতে পারি।'

"খুঁজতে খুঁজতে সত্যি সত্যিই সে দেখতে পেলো, একটা মরা মানুষের মাথার খুলি পড়ে আছে। দেখতে দেখতে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল।

"তখন সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে আবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো, 'ঠাকুর! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টিও হলো। সেই বৃষ্টির জল মরা মানুষের মাথার খুলিতেও পড়লো। এখন কৃপা করে বাকী কয়েকটির যোগাযোগ করে দাও ঠাকুর!'

"লোকটি ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে সে দেখতে পেলো, একটা বিষধর সাপ এগিয়ে আসছে। তখন লোকটি খুব আনন্দিত হলো। আশা-নিরাশায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

"লোকটি আবার প্রার্থনা করতে লাগলো, 'ঠাকুর! এবার সাপও এসেছে; এখনও যেগুলো বাকী আছে, কৃপা করে সেগুলো যোগাড় করিয়ে দাও।'

"প্রার্থনা জানাতে না জানাতেই একটা ব্যাঙও এসে পড়লো। অমনি সাপটা ব্যাঙটাকে তাড়া করলো। মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে সেই সাপটা ব্যাঙটাকে ছোবল দিতে গেল, অমনি ব্যাঙটা লাফিয়ে অন্যদিকে সরে পড়লো। আর সাপের বিষ খুলির ভিতর পড়ে গেলো। এই অবস্থা দেখে লোকটি আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো।"

ঈশ্বর লাভের জন্যও চাই এরকম নিষ্ঠা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর অসাধারণ ধী ক্ষমতায় একের পর এক অপূর্ব সুন্দর গল্পের ভিতর দিয়ে আপামর জনসাধারণকে অমেয় রসের সাগরে অবগাহন করিয়ে দিয়েছেন লোকশিক্ষা। বলেছেন ঈশ্বর লাভ করতে হলে চাই ঐকান্তিক বিশ্বাস, চাই একাগ্রতা আর নিষ্ঠা।

রামকৃষ্ণদেব শ্রীরাধিকার সর্পাভিসারের গল্প বললেন। সে গল্পও ব্যাকুলতার গল্প—ঐকান্তিক নিষ্ঠার গল্প।

"নিকুঞ্জে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশির সংকেত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শ্রীরাধিকার কর্ণকুহরে সে ধ্বনি এসে পৌছালো। অমনি তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ললিতা আর বিশাখাকে নিয়ে শ্রীমতী সাজতে বসলেন। যাবেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ অভিসারে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হযে গেল। এই ঝড জলের মধ্যে বাইরে যাবে সাধ্য কার? ললিতা আর বিশাখা শ্রীমতীকে বললো, 'এই ঝড় জলের মধ্যে কি করে যাবো নিকুঞ্জে?'

"কিন্তু শ্রীমতী আজ যেন উন্মাদিনী। তিনি আজ যেন সমস্ত মর্যাদা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেছেন। তিনি কারো নিষেধ শুনলেন না। প্রচণ্ড ঝড বৃষ্টির মধ্যেই শ্রীরাধিকা বেরিয়ে পড়লেন। ললিতা আর বিশাখাই বা কি করে? তারাও শ্রীমতীকে অনুসরণ করলো। পথে বর্ষার জলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সাপ শুয়েছিল। শ্রীরাধিকার সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য অভিলাষে পাগলিনী। তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণের কথাই চিন্তা করছেন। কোথা দিয়ে হাঁটছেন, কি করছেন, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে তাঁর মন একেবারে উতলা। এক অসতর্ক মুহূর্তে সাপের উপর পা দিয়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন—সাথে সাথে ললিতা আর বিশাখাও।

"সাপ আর কেউ নন—তিনি স্বয়ং অনন্তনাগ। যেমনি ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন—অমনি অনন্তদেব বিরাট ফণা বিস্তার করে তাঁদের একেবারে নিকুঞ্জের ধারে পৌছে দিলেন।

"একি! একেবারে নিকুঞ্জে এসে পড়েছি, যে! ও মাগো! এ যে দেখছি, মস্ত একটা সাপ!'

"সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়লো সাপের উপর থেকে। শ্রীরাধিকা বললেন, 'চলো পালাই কৃষ্ণের কাছে।'"

একেই বলে শ্রীরাধিকার সর্পাভিসার। যদি আমরা ঈশ্বরানুরাগে নিজেদের রঞ্জিত করতে পারি, যদি আসে আমাদের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা—তবেই তো আমরা তাঁর বংশীধ্বনি শুনতে পাবো।

॥ পাঁচ ॥

ঋষিগণ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ঐক্য স্বীকার করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব' অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মই বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' গীতায় আছে, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' অর্থাৎ ব্রহ্মই সব হয়েছেন। ঋষিগণ মনে করেন যে, সত্তার দিক থেকে জীব ও ব্রহ্ম এক। তাঁরা এই দুয়ের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ দেখতে পান না। কিন্তু কর্মের দিক থেকে এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মানুষ হচ্ছে ঈশ্বর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। পরমাত্মার এক একটি স্বতন্ত্র কর্মকেন্দ্র হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ। স্বতন্ত্র বলছি এই জন্য যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। মানুষের মধ্যে আছে, 'অহংবোধ'। কোন কোন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতে মানুষের মধ্যে অহংবোধ না থাকলে মানুষ প্রকৃতির হাতে একটা তামসিক ক্রীড়াপুত্তলি হিসাবে পরিগণিত হতো। আর মানুষের মধ্যে এই অহংবোধ আছে বলেই তো পরম ব্রহ্মের পক্ষে জগৎলীলা সম্ভব হয়েছে। মানুষ যখন সাধারণের ভিতর দিয়ে পরমাত্মা থেকে নিজেকে অভিন্ন দর্শন করে তখনই মানুষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। শুধু মানুষই নয় প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। তিনি আছেন জল স্থলে অন্তরীক্ষে। তিনি আছেন সর্বভূতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পরিবেশিত সংগীতের মূর্ছনায় সেই ভাবটিই কি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

> "(আমার মা) ত্বং হি তারা ! তুমি ত্রিগুণ ধরাপরাপরাৎপরা।
> তোরে জানি মা ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
> তুমি জলে তুমি স্থলে তুমিই আদ্য মূলে গো মা,
> আছ সর্ব ঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা॥
> তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
> তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা॥"

কোন কোন ভক্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞেস করেছিল—ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন কিনা! রামকৃষ্ণদেব স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, সর্বভূতেই ঈশ্বর বিরাজমান।

সর্বভূতে ঈশ্বর থাকলেও তিনি আবার সাধারণ মানুষের জন্য এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, সৎলোকের সঙ্গে মাখামাখি করবে আর অসৎ লোকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, তাই বলে কি বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে? সুন্দর এক গল্প বলে রামকৃষ্ণদেব আমাদের সংশয় দূর করে দিলেন।

"কোন বনে এক সাধু থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্য-সামন্ত। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন। একজন শিষ্য সে উপদেশ খুব মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলো।

"একদিন শিষ্যটি হোমের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে বনে গেল। এমন সময়ে একটা চীৎকার শোনা গেল, 'পালাও, পালাও, পাগলা হাতি আসছে।'

"সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু শিষ্যটি পালালো না। সে জেনেছে যে, পাগলা হাতিও নারায়ণ। তাই সে দাঁড়িয়ে করজোড়ে পাগলা হাতির স্তব করতে লাগলো।

"এদিকে হাতির মাহুতও চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'পালাও, পালাও।' শিষ্যটি তবু নড়লো না। হাতিটা যখন শিষ্যটির কাছে এসে পড়লো, তখন তাকে শুঁড়ে করে তুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। শিষ্যটি ক্ষত বিক্ষত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলো।

"এই খবর পেয়ে সবাই এসে ধরাধরি করে তাঁকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে পরিচর্যা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে গুরুদেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাগলা হাতি আসছে জেনেও তুমি সরে গেলে না কেন?'

"শিষ্যটি বললো, 'গুরুদেব, আপনি আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন। তাই হাতিরূপী নারায়ণ আসছে দেখেও আমি সরে যাইনি।'

"গুরু তখন বললেন, 'হাতি নারায়ণ আসছিলো বটে, কিন্তু মাহুতরূপী নারায়ণ তো তোমাকে নিষেধ করেছিল। তার কথা শুনলে না কেন?'"

এই সরস গল্পের ভিতর দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন বটে, কিন্তু খল বা দুষ্ট প্রকৃতির লোক থেকে দূরে থাকা উচিত।

রামকৃষ্ণদেব আবার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে কি ভক্তিময় কথা বললেন।

"শাস্ত্রে আছে, আপো নারায়ণঃ অর্থাৎ জলও নারায়ণ। কিন্তু সব জল ঠাকুর সেবায় লাগে না। কোন জলে আঁচানো যায়, কোন জলে বাসন মাজা যায়, কোন জলে কাপড় কাচা চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবায় চলে না।"

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নারায়ণ বিরাজিত রয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রয়েছে পার্থক্য। এ ঈশ্বরেরই লীলা। তাই সর্বভূতে নারায়ণ বিরাজিত থাকা সত্বেও অসাধু অভক্ত কিংবা দুষ্ট লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে না। এইরূপ লোকের কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হয়।

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কি অমৃতময় কণ্ঠে বললেন, "ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন বটে, তবে ভক্ত হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থল।"

তিনি আবার প্রতীক দিয়ে সংশয় দূরীভূত করে দিলেন। বললেন, "কোন জমিদার তার জমিদারীর সর্বত্র থাকতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি তার অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন।"

সেইরূপ ভক্তের হৃদয় হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা।

সৎ এবং অসৎ সব রকম লোকের সঙ্গেই আমাদের মেলামেশা করতে হয়। কিন্তু দুষ্ট লোকের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেজন্য রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, মাঝে মাঝে তমোগুণ প্রদর্শন করতে হয়। অবশ্য দুষ্ট লোক অনিষ্ট করবে বলে তার অনিষ্ট চিন্তা করা উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এক রসমিশ্র গল্প বললেন।

"এক মাঠে কতকগুলো রাখাল বালক গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ ছিল। সবাই সেই সাপের ভয়ে ভীত। একদিন এক সন্ন্যাসী সেই মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাখাল বালকেরা তাঁকে দৌড়ে এসে বললো, 'ঠাকুরমশাই ওদিকে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ আছে।'

"সন্ন্যাসী বললেন, 'আমার তাতে ভয় নেই—আমি সাপের মন্ত্র জানি।'

"সন্ন্যাসী এগিয়ে যেতেই সাপটা ফণা তুলে তেড়ে এলো। অমনি সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়লেন, আর সাপটা কেঁচোর মত সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে পড়ে রইলো।

"সন্ন্যাসী সাপটাকে বললেন, 'ওরে তুই কেন হিংসা করিস? আয়, তোকে মন্ত্র দিই। এই মন্ত্র জপলে তোর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না, আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হবে'—এই বলে সন্ন্যাসী সাপটিকে মন্ত্র দিলেন।

"কিছুদিন যায়। রাখাল বালকেরা দেখলো, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢিল মারলেও চুপ করে থাকে। ওরা তখন নানাভাবে সাপটাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। একদিন একটি রাখাল বালক সাপটার ল্যাজ ধরে ঘুরিয়ে ওকে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সাপটা অচৈতন্য হয়ে পড়লো।

"অনেকক্ষণ পর সাপটির চেতনা হলে অতিকষ্টে তার গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়লো। বাইরে আর বেরুতে পারে না। না খেয়ে না খেয়ে সাপটার শরীর একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেল।

কিছুদিন পর সন্ন্যাসী আবার সেই পথেই এলেন। তিনি সাপটাকে খুঁজতে লাগলেন। সাপটা গুরুদেবের আওয়াজ পেয়ে কোন ক্রমে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো।

"সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই এত রোগা হয়েছিস কেন?'

"সাপটি বললো, 'ঠাকুর, আপনি হিংসা ত্যাগ করতে বলেছিলেন, সেজন্য রাখাল বালকেরা আমাকে ধরে আছাড় মেরেছিল।'

"সন্ন্যাসী বললেন, 'ছি, তুই এত বোকা যে নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না। আমি তোকে কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ফোঁস করতে তো নিষেধ করিনি।"

দুষ্ট লোক অনিষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। এর ফলে অনেক সৎ লোকও নানা ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন। তাই দুষ্ট লোককে ফোঁস করে ভয় দেখাবার প্রয়োজন আছে বৈকি! কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বললেন যে, কারো যেন অনিষ্ট চিন্তা করা না হয়।

॥ ছয় ॥

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না।"

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—এসব শাস্ত্র বার বার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। সেজন্য এগুলো উচ্ছিষ্ট। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু আজ পর্যন্ত তা কেউ মুখে বলতে পারেনি। সেজন্য ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট। ব্রহ্ম কি—বাক্য দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য জ্ঞানীরা বলেছেন, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর। ব্রহ্ম নির্বিকার। ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্র থাকলেও, ব্রহ্মের কোনরূপ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। ব্রহ্ম উপলব্ধির ব্যাপার।

ব্রহ্ম যে বাক্যের অতীত, মুখে বলে বুঝানো যায় না, সে সম্পর্কে একটি গল্প আছে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যে। সেই গল্পে বাহ্ব এবং বাস্কলি নামক গুরু শিষ্যের কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে।

শিষ্য বাস্কলি বললেন, 'ভগবান! আপনি আমাকে ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিন।'
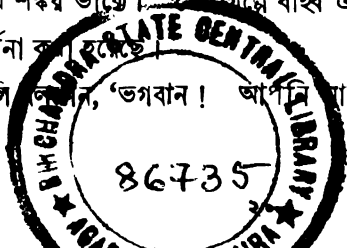
বাহ্ব চুপ করে রইলেন, কোন কথা বললেন না। বাস্কলি বার বার প্রার্থনা করা সত্বেও বাহ্ব নিরুত্তর রইলেন।

কেন তিনি বাস্কলির প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না—এই কথা জিজ্ঞাসা করা হলে বাহ্ব বললেন, 'আমি তো উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু তুমি শুনতে পাচ্ছ না।'

নিরুত্তর থেকে বাহ্ব বাস্কলিকে হয়তো এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ব্রহ্ম বাক্যের অতীত।

ব্রহ্ম সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগর মশাইকে অপূর্ব রসঘন এক গল্প বলেছিলেন। সে গল্পে ফুটে উঠেছিল তাঁর গভীর প্রজ্ঞার ছায়া।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "এক বাপের দুই ছেলে। ব্রহ্ম বিদ্যা শেখাবার জন্য ছেলে দুটিকে পাঠালেন তিনি আচার্যের কাছে। কয়েক বছর পর শিক্ষা সমাপন করে ছেলে দুটি ফিরে এলো গৃহে।

"বাবা বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রহ্ম কি জিনিস বল দেখি।'

"বড় ছেলে শাস্ত্র থেকে নানা শ্লোক বলে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে লাগলো।

"এবার তিনি ছোট ছেলেকেও জিজ্ঞেস করলেন। সে শুধু চুপ করে রইলো।

"বাবা তখন খুশি হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু, তুমি একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না।'"

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রহ্ম কি—তা সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে?

যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন হলেও জ্ঞেয়। তপস্যার ভিতর দিয়েই ব্রহ্মোপলব্ধি হয়ে থাকে। চরম তত্ত্ব বাক্যমনের অতীত। বেদে আছে—তিনি আনন্দ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। দীর্ঘদিন ধরে কঠোর তপস্যা করতে করতে সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তিনিও ব্রহ্ম কি তা মুখে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই তখন ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

ব্রহ্ম সম্পর্কে সামান্য এক উদাহরণ দিয়ে তাকে অসামান্যতায় পরিণত করলেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি বললেন, "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তার খবর দেবে। কিন্তু খবর দেওয়া আর হলো না। যেই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খবর দেবে?"

যখন 'আমি' 'তোমাতে' মিশে গেলাম। তখন আমার আর পৃথক অস্তিত্ব কোথায়? অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে 'আমি' তুমিই হয়ে গেলাম। তখন আমার 'অহং' সত্তা বলতে আর কি রইলো? তখন আমি কি করে বলবো

যে, তোমার সাথে আমি কি করে মিশে গেলাম? তাই ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না।

আবার এক রসাশ্রিত গল্প বলে রামকৃষ্ণদেব জটিল তত্ত্বটিকে বুঝিয়ে দিলেন সহজতম প্রকাশে।

"চার বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে প্রাচীর ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলো। খুব উঁচু সে প্রাচীর। প্রাচীরের ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তাদের খুব কৌতুহল হলো। অনেক চেষ্টার পর প্রাচীর বেয়ে একজন উপরে উঠলো। উঁকি মেরে সে যা দেখলো, তাতে অবাক হয়ে সে 'হা-হা-হি-হি' করে ভেতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিতে পারলো না। এরপর যেই প্রাচীর বেয়ে উপরে ওঠে সে-ই হা-হা-হি-হি করে পড়ে যায়। তখন কে আর খবর দেবে?"

বিচার যেখানে থেমে যায় সেইখানেই ব্রহ্ম। রামকৃষ্ণদেব সুন্দর উপমা দিয়ে বললেন, "কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।" বিচার বন্ধ হলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। আবার রামকৃষ্ণদেবের অনবদ্য উপমা, "থিয়েটারে গিয়ে লোকে কত গল্প করে। যেই পর্দা উঠে যায়, সব গল্প টল্প বন্ধ হয়ে যায়। তখন থিয়েটার দেখায় মগ্ন হয়ে থাকে।"

জড় ভরত, দত্তাত্রেয় প্রমুখ মুনি ঋষিরা ব্রহ্মদর্শন করে আর খবর দিতে পারেন নি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সমাধি হলে আর অহংবোধ থাকে না। রামকৃষ্ণদেব উপমা দিয়ে বললেন, "কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।" আবার কি সুন্দর বাস্তবধর্মী গভীর উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি বললেন "শিবনাথ শাস্ত্রী যতক্ষণ সভায় আসেননি, ততক্ষণই তাঁকে দেখবার জন্য হট্টগোল। যেই তিনি এলেন, অমনি তাঁকে দেখে সবাই চুপ মেরে গেল।"

ব্রহ্মলীন হয়ে গেলে স্তব্ধতার কথা বলেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব আরও নানাভাবে অমৃতময় ব্যঞ্জনায়।

তিনি বলেছেন, "পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্ করে আওয়াজ হয়। কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হয়ে গেলে পর আর শব্দ হয় না। যতক্ষণ কলসী পূর্ণ না হয় ততক্ষণই শব্দ।"

একটার পর একটা অপূর্ব রসাশ্রিত উপমা। প্রতীক দিয়ে রামকৃষ্ণদেব ভক্তের সমস্ত সংশয় দূরীভূত করতে চান। তিনি আবার বললেন, "ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘিয়ের কোন শব্দ নেই।"

ভাবরস সৃষ্টি করে আবার তিনি বললেন, "বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ? মৌমাছি

যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ভন্‌ করে। যেই ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করে, অমনি চুপ হয়ে যায়।"

আবার রামকৃষ্ণদেবের অত্যাশ্চর্য রসাশ্রিত উদাহরণ। তিনি বললেন, "ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রথমে খুব হৈচৈ হয়। যখন সবাই পাতা নিয়ে বসে, তখন হৈচৈ অনেকটা কমে যায়। কেবল 'লুচি আন, লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারি খেতে আরম্ভ করে, তখন বারো আনা শব্দ কমে যায়। যখন দই আসে, তখন শুধু সুন্‌সুন্‌ শব্দ। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ-চাপ।"

ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব আবার একটি বিস্ময়কর গল্প গাঁথলেন। গল্পটি এ রকম: "এক পণ্ডিত কোন এক রাজাকে রোজ ভাগবত পড়ে শোনাতো। আর পড়ার শেষে রোজই রাজাকে জিজ্ঞেস করতো, 'রাজা বুঝেছ?' আর রাজাও রোজ বলতো, 'আগে তুমি বোঝ।' পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে ভাবতো, রাজা রোজ অমনধারা কথাবার্তা বলে কেন?

"ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতের জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে; আসল হচ্ছে হরি পাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেল সেই ব্রাহ্মণ। রোজ কত বক্তৃতা ঝাড়তো, কিন্তু যাবার আগে বলে গেল দুটি কথা, এবার বুঝেছি।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছনায় সেই কথারই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন:

"ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে
কভু সন্ধি নাহি পায়।"

॥ সাত ॥

ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে অনেক পথের কথা জ্ঞানী ও যোগীরা বলেছেন।

আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, এবং ভক্তিযোগের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

আমাদের দেশের বহু মনস্বী শাস্ত্রকার জ্ঞানযোগের কথা বলেছেন। জ্ঞান-যোগের পথ হচ্ছে বিচারের পথ। রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, এ পথ অত্যন্ত কঠিন পথ।

বেদে উল্লেখ আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মনকে তুলতে পারলে সাধক সমাধিলাভ করেন। মনের নিম্নভূমিতে মানুষের আসক্তি থাকে সংসারের প্রতি। মন যখন হৃদয়ে ওঠে, তখন মানুষ জ্যোতি দর্শন করতে পারে। এরপর মন ওঠে কণ্ঠে। ভ্রূমধ্যে এবং কপালে মন স্থির হলে পর মানুষ সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করতে পারে। এইভাবে সপ্তম ভূমিতে জল স্থির হলে মানুষের অহংবুদ্ধি লোপ পায় এবং তখন মানুষ সমাধি অবস্থা লাভ করে।

তৈত্তেরীয় উপনিষদের ঋষি ভৃগুর কাহিনী এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গিয়ে বললেন, 'ভগবান, ব্রহ্ম কি সে সম্পর্কে আপনি আমাকে উপদেশ দিন।'

বরুণ বললেন, তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে হয়। তুমি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হও।'

ভৃগু ধ্যান করে বুঝতে পারলেন যে, 'অন্নং ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ জড়ই ব্রহ্ম। কিন্তু ভৃগু জড়ই ব্রহ্ম জেনে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, জড়ই সব নয়। জড় থেকে প্রাণ স্বতন্ত্র।

পিতার নির্দেশে ভৃগু আবার ধ্যানে বসলেন। ধ্যান করতে করতে তাঁর মনে হলো, 'প্রাণং ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ প্রাণই ব্রহ্ম। কিন্তু আবার তাঁর ধারণা হলো, প্রাণই তো শেষ কথা নয়। চেতনা মন প্রাণ থেকে আলাদা।

ভৃগু আবার ধ্যানে বসলেন। তখন আবার তাঁর উন্নততর উপলব্ধি হলো যে, 'মনো ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ মন বা চেতনাই ব্রহ্ম।

কিন্তু এখানেও ভৃগুর তপস্যার শেষ নয়। পিতার নির্দেশে ভৃগু আবার ধ্যানে বসলেন। ভৃগুর আরও উন্নততর উপলব্ধি হলো যে, 'বিজ্ঞানম্ ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।

এতেও ভৃগু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আরও গভীর তপস্যা দ্বারা ভৃগুর উপলব্ধি হলো যে, 'আনন্দং ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ 'আনন্দ থেকেই জীবের উৎপত্তি' এবং অবশেষে সমস্ত জীবই আনন্দাভিমুখে গমন করেন।

জ্ঞানযোগে ব্রহ্মকে জানতে হলে 'নেতি, নেতি' করে এগিয়ে যেতে হয়। বুঝতে হয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মদেহ নয়। ব্রহ্ম মন নয়; ব্রহ্মের রোগ, শোক, জরা মৃত্যু নেই। আকাশ ব্রহ্ম নয়, চন্দ্র ব্রহ্ম নয়, সূর্য ব্রহ্ম নয়—এমনি করেই এগিয়ে যেতে হয়।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব সুন্দর একটি গল্প বললেন। "একজন কৃষকের ক্ষেতে ফসল ফলেছে খুব ভাল। কিন্তু তার মুস্কিল হলো, চোর এসে ক্ষেতের ফসল চুরি করে নিয়ে যায়। তখন সে একটা উপায় বার করলো। সে মানুষের চেহারায় খড়ের একটা মানুষ তৈরি করে টাঙিয়ে রাখলো ক্ষেতের মাঝখানে। চোরেরা চুরি করতে গিয়ে রাত্রিতে সেই মূর্তিটা দেখে ভয় পেলো। তখন চোরের সর্দার গুটি গুটি পায়ে পায়ে মূর্তিটার কাছে এসে দেখলো, এটা একটা খড়ের মূর্তি। সে তখন অন্য চোরেদের ডেকে বললো, ভয় নেই, এটা মানুষ নয়, খড়।' তবু চোরেরা এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। তখন চোরের সর্দার খড়ের তৈরি মানুষটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, 'নেতি, নেতি'—এ কিছু নয়, এ কিছু নয়।"

বেদান্তবাদীদের বিচারে সংসার মায়াময়; ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর জগৎ মিথ্যা। পরমাত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই সাক্ষী স্বরূপ। এ সব তত্ত্বকথা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একের পর এক রসস্নিগ্ধ গল্প বা কাহিনী বলে কঠিন তত্ত্ব কথা একেবারে প্রাঞ্জল করে দিলেন। এখানেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব। তিনি কাহিনীর পর কাহিনী গেঁথে মানুষকে অমেয় রসসাগরে অবগাহন করিয়েছেন।

জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব সুন্দর একটি গল্প বললেন অপূর্ব ব্যঞ্জনায়। "কোন এক দেশে এক চাষী ছিল। সে খুব জ্ঞানী। পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে। ছেলের নাম হারু। ছেলেটা বাপ-মা উভয়েরই খুব আদরের।

"চাষীটি খুব ধার্মিক বলে গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালবাসে।

"একদিন সে মাঠে কাজ করছিল, এমন সময় খবর এলো যে, ছেলের কলেরা হয়েছে। চাষীটি বাড়ি গিয়ে ছেলের অনেক চিকিৎসা করালো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেটি আর বাঁচলো না। চাষীর স্ত্রী শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

"কিন্তু চাষীটির যেন কিছুই হয়নি। সে আবার চাষ-বাসের কাজে মন দিল। একদিন সে বাড়ি ফিরে দেখে, তার স্ত্রী ভয়ানক কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। স্ত্রী চাষীটিকে বলছে, 'তুমি কি নিষ্ঠুর! ছেলেটার জন্য একবারও একটু চোখের জল ফেললে না।'

"চাষীটি স্ত্রীকে স্থিরভাবে বললো, 'কেন কাঁদছি না জানো? আমি কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি। খুব আনন্দে আছি। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এখন মহাভাবনায় পড়েছি—আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করবো না এই এক ছেলের জন্য শোক করবো?"

চাষীটি জ্ঞানী। তার কাছে স্বপ্ন অবস্থাও মিথ্যা আর জাগ্রত অবস্থাও মিথ্যা; একমাত্র সত্য বস্তু হচ্ছে পরমব্রহ্ম। তাই চাষীটি তার চরম দুঃখের মধ্যেও অনুভব করতে পারছিলো একটি সুধাময় অতলস্পর্শ তৃপ্তি।

যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই নীরবতা। জ্ঞানযোগে 'নেতি, নেতি' করে এগিয়ে গিয়ে যখন ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তখনই আর কোন জিজ্ঞাসা থাকে না।

এ সম্পর্কে কি সুন্দর রসাশ্রিত একটি ঘরোয়া ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণদেব।

"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। সাথে আছে সেই যুবকটির সমবয়স্ক কয়েকজন বন্ধু। ওরা বৈঠকখানায় বসে গল্পগুজব করছিল। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে মেয়েটি আর তার সমবয়সী বান্ধবীরা তাদের দেখেছিলো। মেয়ের বান্ধবীরা বরকে চেনে না।

"একটি ছেলেকে দেখিয়ে বান্ধবীরা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছে, 'ঐটি কি তোর বর?'

"মেয়েটি হেসে বললো, 'না।'

"তারপর আরেকজন যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'ঐটি কি?'

"'উঁহু। সেও নয়।'

"আবার আরেকজনকে। আবার অস্বীকার। শেষকালে যখন ঠিক ঠিক বরটিকে লক্ষ্য করে বলছে, তবে এইটিই তোর বর'—তখন মেয়েটি হাঁও বলে না, নাও বলে না।"

আবার রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। "অন্ধকার ঘর। বাবু শুয়ে আছেন। একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে বাবুকে। একটা চেয়ারে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়। জানালায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়। নেতি! নেতি! নেতি! শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে যখন, তখন বলছে, ইনিই বাবু।"

জ্ঞানযোগ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেবের আবার অমৃতকল্প গল্প। রসাশ্রিত অনন্ত ভঙ্গীতে তিনি বললেন, "শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য জনক রাজার কাছে গিয়েছিলেন, তখন জনকরাজা বললেন, আগে দক্ষিণা দাও।'

"শুকদেব বললেন, 'আগে জিনিস না পেলে কি করে দক্ষিণা দিই?'

"জনক রাজা হাসতে হাসতে বললেন, ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কি আর গুরু শিষ্যবোধ থাকবে? তখন কেবা জনক আর কেবা শুক, আর কীইবা দক্ষিণা! তাই বলি আপু দক্ষিণাটি আগে ফেলে দাও।"

যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই চুপ।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন জীব নিত্য মুক্ত। জীব নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে বলে তারা দুঃখ পায়; তার কারন জীবের অজ্ঞতা। জীব আত্মবিস্মৃত। সে নিজের পরিচয় জানে না। জীব কতকগুলো 'পাশ' থেকে মুক্ত হতে পারে তবেই সে শিব হিসাবে উন্নীত হতে পারে এবং পরমব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে পারে।

রামকৃষ্ণদেব এক গল্পের ভিতর দিয়ে জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন।

গল্পটি এই রকম: "একটা বাঘিনী একবার এক ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একজন ব্যাধ দূর থেকে দেখে তীর বিদ্ধ করে বাঘিনীটিকে মেরে ফেললো। বাঘিনীটির পেটে ছিল বাচ্চা। মরে যাবার আগে বাঘিনীটির বাচ্চা প্রসব হয়ে গেল। সেই ব্যাঘ্র শাবকটি ছাগলগুলোর সঙ্গে বড় হতে লাগলো। প্রথমে ছাগলের দুধ খায়। তারপর একটু বড় হয়ে ছাগলগুলোর সঙ্গে ঘাস খেতে লাগলো। আবার ছাগলের মত 'ভ্যাভ্যা' করে ডাকতে লাগলো। কোন জন্তু-জানোয়ার ছাগলের পাল আক্রমণ করলে বাঘের বাচ্চাটিও ছাগলগুলোর সঙ্গে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

"একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলের পাল আক্রমণ করলো। বাঘটি অবাক হয়ে দেখলো যে, ছাগলগুলোর মধ্যে একটা ব্যাঘ্র শিশুও ঘাস খাচ্ছে। বাঘের ভয়ে ছাগলগুলোর সাথে সেই ব্যাঘ্র শিশুটিও দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। তখন বাঘটি ছাগলগুলোকে না ধরে সেই ঘাসখেকো বাঘের বাচ্চাটিকে ধরলো। সেটা ভ্যাভ্যা করতে লাগলো আর পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন

বাঘটি সেই ঘাসখেকো ব্যাঘ্র শাবকটিকে একটা জলাশয়ের ধারে টেনে নিয়ে গেল। তাকে বললো, 'এই জলের ভেতর তোর মুখ দেখ। চেয়ে দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি।'

"আবার বাঘটি ওর মুখে এক টুকরো মাংস গুঁজে দিল। প্রথমে বাঘের বাচ্চাটি কোন মতেই মাংস খেতে চায় না। জোর জবরদস্তি করায় খেল একটু। তারপর মাংসের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগলো। তখন বাঘটা বললো, 'তুই এতদিন ছাগলের সঙ্গে ছিলি বলে ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি। ধিক্ তোকে।'

"তখন বাঘের বাচ্চাটি লজ্জিত হলো।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গল্পটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, ঘাস খাওয়া হচ্ছে—সংসারে কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকা, ছাগলের মত ভ্যাভ্যা করে ডাকা আর ভয়ে পালানো হচ্ছে—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘ হচ্ছে গুরু—যিনি চৈতন্য করান। নিজের মুখ দেখা হচ্ছে—নিজের স্বরূপকে জানা।

আমরাও কামিনী কাঞ্চনে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে, নিজের স্বরূপকে জানার চেষ্টা করবো।

॥ আট ॥

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, 'কর্মযোগ' না করে কোন পুরুষই কর্মত্যাগ রূপ জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা লাভের অধিকারী হয় না। চিত্ত শুদ্ধি ছাড়া কেবল কর্মত্যাগ করে কেউ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়। ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করে ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে প্রত্যেকেরই কর্ম করা উচিত।

রামকৃষ্ণদেব কি অপূর্ব ভঙ্গীতে বললেন, "সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরেতে। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু আর সবই অবস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড়-চোপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ঈশ্বর লাভ হয় না। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই।"

কর্মযোগ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, "কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করার নির্দেশ রয়েছে, কলিকালে তা করা বড় কঠিন। এমনিতেই মানুষের অন্নগত প্রাণ।" একটা বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়ে

তিনি আরও সহজ করে দিলেন। বললেন, "জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করাতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশি দেরী সয় না।"

ফলাকাঙ্ক্ষী না হয়ে সৎ কর্মের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। 'কর্মযোগে' প্রথমে কর্মের খুব প্রাধান্য থাকে। যতই মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায়, ততই তার কর্মের আড়ম্বর কমে আসে। এসম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব সুন্দর এক ঘরোয়া চিত্র আঁকলেন :

"গৃহস্থের বউ অন্তসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেন। দশমাস হলে কর্ম প্রায় করতেই হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্মত্যাগ। মা ছেলেটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরের সব কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা—এরা করে।"

আমার উপর যেসব আরব্ধ কর্ম রয়েছে আমি সেগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাবো আর শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো, ঠাকুর! আমার কর্ম কমিয়ে দাও। তোমার পাদপদ্মেই যেন আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে।

আমার সামর্থ্যের মধ্যে যদি কাউকে কিছু উপকার করতে পারি, তবে তা আমার মহত্ত্ব নয়, এ ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। দয়া, পরোপকার এগুলো ঈশ্বরই লোক বিশেষ দিয়ে করিয়ে নেন। কিন্তু আমরা আমাদের সামান্যতম ত্যাগকে নিজেদের মহত্ত্ব বলে কতই না গর্ব করি। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, "দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরের উপকার করবে! মানুষের এত নকর-চপর; কিন্তু মানুষ যখন ঘুমোয় তখন কেউ যদি তার মুখের উপর প্রস্রাব করে দেয় সে টের পায় না। মুখ ভেসে যায়। তখন অভিমান অহংকার থাকে কোথায়! মানুষ আবার কি দয়া করবে! দান-ধ্যান সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

সংসারী মানুষ যদি অনাসক্ত হয়ে কাউকে কিছু দান করে তবে তা নিজের উপকারের জন্য—পরোপকারের জন্য নয়। হরি জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা হরি সেবা হয়। একেই বলে কর্মযোগ।"

রামকৃষ্ণদেব বলেন যে, দয়া সত্ত্ব গুণ থেকে হয়। সত্ত্ব গুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি আর তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণেরই ঊর্ধ্বে। নিষ্কাম কর্ম দীর্ঘ দিন ধরে করতে করতে তবে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিনগুণকে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যেন চোরের মত'। এই বলেই তিনি এক বিস্ময়কর গল্প গাঁথলেন :

"একটি লোক বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে পাকড়াও করলো। ডাকাতরা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলো।

"একজন ডাকাত বললো, 'এই লোকটাকে মেরে ফেলতে হবে'—এই বলে সে খাঁড়া নিয়ে এগিয়ে এলো।

"তখন আরেকজন ডাকাত বললো, 'নাহে, একে মেরে কি হবে? বরং ওর হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে যাই।'

"তখন ডাকাতরা সেই লোকটার হাত-পা বেঁধে জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গেল।

"কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এসে বললো, 'আহা, তোমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। এসো, আমি তোমার বাঁধন খুলে দিই।'

"বাঁধন খুলে দিয়ে ডাকাতটি বললো, 'আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে সদর রাস্তায় তুলে দিয়ে আসি।'

"সদর রাস্তায় এসে ডাকাতটি বললো, এই রাস্তা ধরে যাও, তাহলেই তোমার বাড়িতে পৌছতে পারবে।'

"তখন লোকটি ডাকাতটিকে বললো, 'আপনি আমার অনেক উপকার করলেন, অন্ততঃ আমার বাড়ি পর্যন্ত চলুন।'

"ডাকাতটি বললো, 'না, আমার ওখানে যাবার কোন উপায় নেই। তাহলে পুলিসে টের পাবে।'"

রামকৃষ্ণদেব এই গল্পটি বলে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংসারই হচ্ছে অরণ্য। অরণ্যে আছে তিন ডাকাত—এরা হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতীক। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে চায়; রজোগুণ সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে চায়; কিন্তু সত্ত্বগুণ রজঃ এবং তমোগুণ থেকে রক্ষা করে। সত্ত্বগুণ কাম, ক্রোধ এইসব তমোগুণ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্ত্বগুণ তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। সত্ত্বগুণ সেই পরমধামে যাবার পথ নির্দেশ দিতে পারলেও সত্ত্বগুণ ব্রহ্মজ্ঞান থেকে অনেক দূরে।

রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তার তা করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এসব মেনে চলতে হয়। রামকৃষ্ণদেব শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, অপূর্ব এক উদাহরণ নিয়ে সংশয় দূরীভূত করে দিলেন। তিনি বললেন, "একজন কাঠুরে পরম ভক্ত ছিল। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটেই তার খেতে হয়েছিল।" আরেকটি জ্ঞানময় উদাহরণ দিলেন তিনি অপূর্ব ধী ক্ষমতায়। তিনি বললেন, "দেবকী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের দর্শন পেয়েছিলেন কারাগারে। কিন্তু তাঁর কারাগারের জীবন সহজে ঘুচলো না।"

একের পর এক বিস্ময়কর উদাহরণ। ভাবরসসৃষ্টির জন্য কি রসঘন উক্তি!

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "একজন কানা গঙ্গা স্নান করলো। তাতে তার সব পাপ ঘুচে গেল। কিন্তু তার কানা চোখ আর ভাল হলো না।"

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "নিষ্কাম কর্ম খুব ভাল। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা খুবই কঠিন। মনে করছি নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে যে কামনা বাসনাগুলো সব এসে পড়ে—জানতে দেয় না।

রামকৃষ্ণদেব আরও বললেন যে, কর্মত্যাগ করার কোন উপায় নেই। যার যার প্রকৃতিই তাকে দিয়ে কর্ম করাবে। কর্ম করতে ইচ্ছুক না হলেও প্রকৃতিই কর্ম করিয়ে নেবে। তাই সবার উচিত অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা। আমরা পুজো, জপ আহ্নিক করি—সেগুলোর উদ্দেশ্য ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য—লোকমান্য হবার জন্য নয়। কেউ যদি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে তবেই তাকে বলে 'কর্মযোগ'। কর্মযোগ খুব কঠিন ব্যাপার। কলিযুগে সহজেই আসক্তি এসে পড়ে। আমি মনে করছি যে, আমি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে আসক্তিগুলো এসে ঢুকে পড়ে আমরা তা বুঝতেই পারি না। অনেকে পুজো মহোৎসব করেন, গরীব কাঙালদের ভোজন করান—ভাবেন, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করছেন। কিন্তু লোকমান্য হবার প্রবল ইচ্ছা যে কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করছে তা বুঝতেই পারেন না।

কর্ম করতে করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আমার যেটুকু কর্ম রয়েছে সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা। 'কর্ম'—জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বর লাভের একটা উপায় মাত্র। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটা সরস গল্পের উদাহরণ দিলেন :

"শম্ভু বললো, 'এখন তাই আশীর্বাদ করুন যে, যে টাকা পয়সা আছে সেগুলোর যেন সদ্ব্যবহার করিতে পারি। সেই অর্থব্যয়ে হাসপাতাল, রাস্তাঘাট—এ সমস্ত করতে পারি।'

"আমি বললুম, (রামকৃষ্ণদেব) 'মনে কর, ঈশ্বর তোমার সামনে এসে বললেন, তুমি বর নাও। তাহলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট করে দাও, না বলবে—হে ভগবান! তোমার পাদপদ্মে যেন শ্রদ্ধাভক্তি হয়।"

সাধনার মধ্য দিয়েই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সবই অবস্তু। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব ছোট একটি গল্প বললেন, কিন্তু ইঙ্গিতটি কত গভীরে!

গল্পটি এ রকম : "কোন এক স্থানে সোনার কলসি আছে জেনে একটা লোক ছুটে গিয়ে সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করলো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে শুধু খুঁড়ছে আর খুঁড়ছে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় ঠন্ করে কোদালের শব্দ হতেই সে কোদাল ফেলে দেখে ঠিক ঠিক কলসি বেরিয়েছে কিনা। কলসি দেখে আনন্দে নাচতে থাকে লোকটি। কলসি তুলে মোহর ঢালে, হাতে করে গোনে—তখন তার আনন্দ দেখে কে! একে বলে দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভোগ।"

তাঁকে পাবার জন্যে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করলেই একদিন না একদিন ফল পাবো—তখন তাঁকে দর্শন করে হবে আমাদের আনন্দ লাভ ও তৃপ্তি।

অন্য প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের অন্য এক গল্প। কাঠুরিয়ার গল্প। সাধনার ভিতর দিয়ে তাঁর কৃপালাভের গল্প।

"একজন কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। বনে এক সন্ন্যাসীর সাথে তার দেখা হলো। সন্ন্যাসী কাঠুরিয়াকে বললেন, 'শুধু এগিয়ে যাও।'

"কাঠুরিয়া বাড়িতে এসে ভাবতে লাগলো, সন্ন্যাসী তাঁকে এগিয়ে যেতে বললেন কেন?

"পরের দিন বনে আরও এগিয়ে গিয়ে কাঠুরিয়া দেখতে পেলো, অসংখ্য চন্দন গাছ রয়েছে। সেই চন্দন গাছ কেটে বিক্রি করে তার খুব লাভ হলো।

"সন্ন্যাসী কাঠুরিয়াকে বলেছিলেন শুধু এগিয়ে যেতে। কয়েকদিন পর কাঠুরিয়া বনে আরও এগিয়ে গিয়ে দেখে, সেখানে রয়েছে রূপোর খনি। তখন সে খনি থেকে রূপো তুলে এনে বিক্রি করতে লাগলো। এতে তার প্রচুর টাকা হলো।

"সন্ন্যাসী তাকে শুধু এগিয়েই যেতে বলেছেন। কাঠুরিয়া আরও এগিয়ে গিয়ে দেখে, এক জায়গায় রয়েছে সোনার খনি। আরও এগিয়ে দেখে, হীরে মানিক সব পড়ে রয়েছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য হলো।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এই গল্পের তাৎপর্য হলো যে, সাধন পথে আমাদের শুধু এগিয়েই যেতে হবে। চরৈবেতি! চরৈবেতি! শুধু এগিয়ে যাও। নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলবো, 'হে ঈশ্বর! আমার কর্ম কমিয়ে দাও। তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও।' তাহলেই একদিন সত্যি সত্যি ঈশ্বরের আলোকবর্তিকা দেখতে পাবো।

॥ নয় ॥

জ্ঞানীরা যাঁকে বলেন 'ব্রহ্ম', যোগীরা তাঁকেই বলেন, 'আত্মা,' আর ভক্তরা বলেন 'ভগবান।' রামকৃষ্ণদেব একটি রসাশ্রিত উদাহরণ দিয়ে বললেন, "একই ব্রাহ্মণ যখন পুজো করে তখন তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন তাকে বলে রাঁধুনি বামুন।"

ভক্তের মনে ভাবরস সৃষ্টি করার জন্যে রামকৃষ্ণদেব প্রশ্ন রাখলেন, "ভক্তের ভাব কিরূপ জান?"

উত্তরে তিনিই বললেন, "ভক্ত বলে, হে ভগবান! তুমিই প্রভু! আমি তোমার দাসানুদাস। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান। তুমি পূর্ণ আর আমি অংশ।"

যে ভক্ত, সে কখনো বলে না যে, আমিই ব্রহ্ম।

পরমপুরুষ বললেন যে, কলিযুগে ভক্তিযোগেই প্রশস্ত। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। একটি সরস উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, "এখন জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশি দেরী সয় না। দশমূল পাঁচনে চলে না। আজকাল চাই ফিবার মিক্‌চার।"

ভক্তের জন্য ঈশ্বর সাকার। ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার রূপে দেখা দেন, অপূর্ব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণদেব, 'যেমন, সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—এর কূল কিনারা নেই। কিন্তু ভক্তি হিমে স্থানে স্থানে জল জমে বরফ হয়ে যায়।'

ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত ভাবে, সাকার রূপ ধরে আসেন।

রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, কলিযুগে ভক্তিযোগের ভেতর দিয়েই ঈশ্বর আরাধনা হচ্ছে সহজতম পথ। ভগবানের নাম গুণকীর্তন আর প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়।

ভক্তের কাছে ঈশ্বর হচ্ছেন সগুণ ব্রহ্ম। তিনি একজন ব্যক্তি হয়ে ভক্তের কাছে ধরা দেন।

মানুষের পক্ষে অনন্ত ঈশ্বরকে কতটুকু জানা সম্ভব? আমরা দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছি। তাই তো আমরা কেবলমাত্র তাঁর পাদপদ্মেই নিজেদের সমর্পণ করে দেবো। তাঁর মহিমা বিচার করার আমাদের প্রয়োজন কি? রামকৃষ্ণদেব বললেন,

"যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, তবে পুকুরে কত জল আছে তা মাপবার চেষ্টা করার আমার প্রয়োজন কি ?"

ঈশ্বরের মহিমা বিচারের চেষ্টা করা বৃথা। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব সুন্দর একটি গল্প বললেন। গল্পটি হলো :

"গ্রীষ্মকাল। দুটি লোক গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে। যেতে যেতে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সামনে একটা বাগানের গাছে পাকা আম ঝুলে আছে দেখে তাদের আম খেতে খুব লোভ হলো।

অমনি একজন হিসাব করতে বসে গেল। বাগানে কতগুলো আম গাছ আছে ; সেই আম গাছগুলোতে কতগুলো ডালপালা আছে ; প্রত্যেক ডালে কত-গুলো আম আছে ; তাহলে সারা বাগানে কত আম হতে পারে—এসব।

অন্যলোকটি এর মধ্যে এগাছ ওগাছ ঘুরে বেশ পাকা পাকা আম খেয়ে নিচ্ছে।"

আমি আম খেতে এসেছি। আম খেয়ে যাবো। বাগানে কত গাছ, সেগুলোর কত ডালপালা এর হিসাবে আমার প্রয়োজন কি ? আমি হবো অমৃতরসিক। আমি শুধু অমৃতের রস আস্বাদন করতে চাই। আমি চাই ভূমানন্দ। তাঁর মহিমা কতদিকে প্রসারিত তা জেনে আমার কি হবে ? আমি শুধু তাঁকে আঁকড়েই থাকবো।

ঈশ্বরকে জানতে হলে প্রথমেই চাই প্রেম অনুরাগ। প্রেম অনুরাগ না হলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। যতক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা না জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি হচ্ছে কাঁচা ভক্তি। ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা হলে সে ভক্তি হয় পাকা ভক্তি। একটি রসস্নিগ্ধ উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণদেব সংশয় দূরীভূত করে দিলেন। তিনি বললেন, "ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি লাগানো থাকে তাহলে ছবি উঠবে। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়লেও সে ছবি উঠবে না। একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ, তেমনি কাঁচ।"

আমি শুধু কাঁচ হবো না। আমার সঙ্গে লেপন করবো রাগভক্তি।

রাগভক্তি হলে ঈশ্বরের উপর ভালবাসা জন্মে। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন তাদের প্রতি আমাদের এক মায়ার আকর্ষণ আছে। রাগভক্তি হলে সেই আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। সংসারটাকে তখন শুধুমাত্র একটা কর্মভূমি বলে প্রতীয়-মান হয়। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেবের কি সুন্দর উদাহরণ। তিনি বললেন, "যেমন কারো হয়তো পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিন্তু কোলকাতায় কর্ম করতে আসা।

কোলকাতায় বাসা করে থাকে কাজ করবার জন্য। কিন্তু মন পড়ে থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। তেমনি সংসার করবে। কিন্তু মন থাকবে ঈশ্বরে নিবদ্ধ।"

বিষয়বুদ্ধি থাকলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। আবার অপূর্ব সুন্দর উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, "দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে যায়, হাজার ঘসলেও জ্বলবে না। বিষয়াসক্ত মন হলে ঈশ্বর লাভ করা যায় না।"

ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে হলে চাই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। শ্রীমতী রাধিকা বলেছিলেন, 'আমি সব কৃষ্ণময় দেখছি।' সখীরা বললো, 'কই আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বকছো?' শ্রীমতী বললেন, 'সখি, আগে অনুরাগ অঞ্জন চোখে মাখো, তবেই তাঁকে দেখতে পাবে।"

চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মনে ময়লা জমে থাকলে ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। মুখে ঈশ্বরের কথা আর অন্তরে কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা থাকলে ঈশ্বরলাভ করা যায় না। রামকৃষ্ণদেব একটি অভিনব উপমা দিয়ে বললেন, "সূচ যদি কাদা দিয়ে ঢাকা থাকে, তবে চুম্বকে আকর্ষণ করে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তবে চুম্বকে আকর্ষণ করে।"

আমাদের মনের ময়লাও চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে হবে।

আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কথাই বলি, লেকচার দিই। নিজেদের ধার্মিক প্রমাণ করার জন্যে উপাসনা, জপ, আহ্নিকও করি। কিন্তু আমাদের ভোগাসক্তি দূরীভূত করে তাঁর পায়ে যাতে শুদ্ধাভক্তি জন্মে সেজন্য আমাদের আন্তরিকতা কোথায়? তাই আমাদের ধর্মচিন্তা বেশির ভাগ হচ্ছে পোষাকী। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব কি সুন্দর করে বললেন, "হাতির দাঁত দু'রকমের—ভেতরের ও বাইরের। বাইরের দাঁত শুধু শোভার জন্য। ভেতরের দাঁতে হাতি খায়।"

তেমনি আমরা ভেতরে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে পড়ে আছি আর বাইরে ধর্মের বড়াই করছি! এও আমাদের এক রকম শোভা। সেই শোভা বর্জন করে অন্তরে রাগভক্তি আনতে হবে। আবার সরস উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বললেন, "অভ্যেস করে পাখি 'রাধাকৃষ্ণ' বলে। বেড়ালে ধরলে 'ক্যাঁ ক্যাঁ' করে চেঁচিয়ে ওঠে।" আমরাও শুধু মুখে মুখে তোতা-পাখির মত 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি আওড়াবো-না। সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করবো।

মনে অহংকার থাকলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবীর গল্প বললেন। গল্পটি হলো: "শ্রীকৃষ্ণ যেদিন ব্রজধামে রাসলীলা করেন সেদিন বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মীদেবীও এলেন লীলা দেখতে।

যোগমায়া দ্বার রক্ষা করছিলো। লক্ষ্মীদেবী এসে তাকে বললেন, 'দ্বার ছেড়ে দাও, আমি রাসস্থলীতে যাবো।'

যোগমায়া বললো, 'আগে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদের প্রাপ্ত হও, তারপর যেতে পারবে রাসস্থলীতে।'

'কি? এত বড় কথা! আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। আমি কিনা গোয়ালা মেয়েদের পদরজে গড়াগড়ি দেবো? যাবো না রাসস্থলীতে। আমি তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে করবো রাসলীলা।'

আজও বৃন্দাবনে বিল্ববনে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করে চলেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো তপস্যার জিনিস নন। গোপীরা সাধন-ভজন কিছুই জানতো না—তাদের একমাত্র সম্বল ছিল প্রেম-ভালবাসা।"

আমি যথার্থ মন্ত্র জানি না—শুদ্ধ উচ্চারণ করে ইষ্টমন্ত্র জপ করার ক্ষমতাও নেই আমার। তবে কি আমার মন্ত্র ঈশ্বরের কানে গিয়ে পৌঁছাবে না? আমরা তো সবাই ঈশ্বরের সন্তান। আমরা যেভাবেই তাঁকে ডাকি না কেন, আমাদের ডাক কি তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছাবে না? রামকৃষ্ণদেব রসাশ্রিত উদাহরণ দিয়ে বললেন, "মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেমেয়েরা কেউ তাকে বাবা, কেউ পাপা—এইসব বলে ডাকে। আবার ছোট ছেলেটি 'বা' কিংবা 'পা' বলে ডাকে। আর যারা 'বা' কিংবা 'পা' পর্যন্তও বলতে পারে না, বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে, ওরা তাকেই ডাকছে। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।"

ভক্তেরা ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকুক না কেন—সবই তিনি শুনতে পান। চাই তাঁর প্রতি ভক্তি আর ভালবাসা। আবার রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব রসাশ্রিত দৃষ্টান্ত। তিনি বললেন, "এক জনের ভাশুরের নাম হরেকৃষ্ণ। এখন হরিনাম তো করতে হবে? কিন্তু হরেকৃষ্ণ বলবার জো নেই। তাই সে জপ করছে :

ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।
ফরে রাম ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে॥"

তাঁর প্রতি অনুরাগই হচ্ছে আসল কথা।

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আমরা কিভাবে প্রকাশ করবো? মন-প্রাণ সমস্ত সত্তা দিয়ে গোপনে তাঁর জন্যে কেঁদে-কেটে আমরা সে অনুরাগ প্রকাশ করবো। কিন্তু তাঁর জন্যে গোপনে কাঁদলে লোকে তো আর আমাকে ভক্ত বলবে না। তাই আমার চাই ভক্তির বহিরঙ্গ। এদিকে আমি কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে বসে

আছি, আর বাইরে নিজেকে, খুব ভক্ত বলে জাহির করার চেষ্টা করছি এভাবেই আমি একজন কপট ভক্ত হয়ে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণদেব কপট ভক্তের এক অপূর্ব সুন্দর গল্প বললেন। গল্পটি হলো: "এক জায়গায় একটি স্বর্ণকারের দোকান ছিল। ওরা পরম বৈষ্ণব। গলায় মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বক্ষণ হরিনাম। এদেরকে একরকম সাধু বললেই হয়; শুধু পেটের দায়ে স্বর্ণকারের কাজ করা। মাগ্-ছেলেদের তো খাওয়াতে পরাতে হবে।

পরম বৈষ্ণব শুনে অনেক খরিদ্দার তাদের দোকানে আসে। খরিদ্দারদের ধারণা, এই দোকানে সোনারূপার কোন রকম গোলমাল হবে না।

একদিন এক খরিদ্দার সেই দোকানে গিয়ে দেখলো যে, দোকানের মালিক মুখে খুব হরিনাম করছে আর অন্যান্য কয়েকজন বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার দোকানে ঢোকা মাত্র একজন বলে উঠলো, 'কেশব। কেশব।' একটু পরেই আরেকজন বলে উঠলো, 'গোপাল! গোপাল!'

গয়না গড়া সম্পর্কে একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আরেকজন বলে উঠলো, 'হরি! হরি! হরি!'

গয়নাগড়া সম্পর্কে যখন পাকা কথা হয়ে গেল তখন একজন বলে উঠলো, 'হর! হর!'

এত ভক্তি প্রেম দেখে খরিদ্দার স্বর্ণকারের কাছে অগ্রিম টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু এতসব ঈশ্বর বন্দনার অর্থ কি?

খরিদ্দার আসার পর যে বলেছিলো, 'কেশব! কেশব!'—এর অর্থ হলো—এরা সব কারা? যে বলেছিলো, 'গোপাল! গোপাল!'—এর মানে হলো, এরা সব দেখছি গোরুর পাল। আর যে বলেছিলো, 'হরি! হরি!'—এর মানে হলো, এরা যখন দেখছি গোরুর পাল—কাজেই এদের সর্বস্ব হরণ করি। আর যে বললো, 'হর! হর!' এর অর্থ হলো, 'হ্যাঁ, এদের হরণ কর।"

সংসারে এরকম ভক্তের অভাব নেই। ভাবের ঘরে চুরি! সেজন্যেই তো আমাদের কিছু হয় না।

আমরা সুদুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছি। ঈশ্বর দর্শন লাভের চেষ্টায় আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত করতে হবে। রামপ্রসাদ গেয়েছেন:

"মনরে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পড়ে আবাদ করলে
ফলতো সোনা॥

কালী বলে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবেনা।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে
যম ঘেঁষেনা॥"

কালী নামে বেড়া দিলে অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হলে আমরা সত্যি সত্যিই একদিন ঈশ্বর দর্শন লাভে সমর্থ হবো। সংসার অনিত্য। তাই সংসারের মায়ায় আমাদের ভুললে চলবে না।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে অহংকার বোধ থাকে, ততক্ষণ মানুষ জ্ঞানলাভ করতে পারে না। সেজন্য এই সংসারে ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। রামকৃষ্ণদেব একটি উপমা দিয়ে বললেন, "বাছুর 'হাম্বা', 'হাম্বা', অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' করে, তাই এত যন্ত্রণা। কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো তৈরি হয়, আবার ঢাকও তৈরি হয়। সেই ঢাক কত পেটানো হয়। শেষে নাড়ি-ভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়, সেই তাঁতে ধুনুরী যখন তুলো ধুনে তখন 'তুঁহু, তুঁহু' অর্থাৎ 'তুমি, তুমি' বলতে থাকে। তখন বলে, 'হে ঈশ্বর, তুমিই কর্তা, আমি অকর্তা, আমি যন্ত্র আর তুমি যন্ত্রী।"

আমরা যারা সংসারে আছি আমাদের কতইনা অহংকার! আমরা কেউ পাণ্ডিত্যের অহংকার করি, কেউ ঐশ্বর্যের অহংকার করি, কেউবা মান, পদ এই সবের অহংকার করি। কিন্তু আমরা জানি না, এসব দুদিনের জন্য। কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না। অপূর্ব এক সংগীতের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন :

"ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, মিছে অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥"

শুধু মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? শুধু ফাঁকা শঙ্খধ্বনি করে কোন লাভ হবে না। রামকৃষ্ণদেব এ সম্পর্কে এক বিস্ময়কর গল্প বললেন। গল্পটি হলো :

"কোন এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে 'পোদো' বলে ডাকতো। সেই গ্রামে একটা পোড়ো মন্দির ছিল। মন্দিরে ঠাকুর বিগ্রহ কিছুই নেই। মন্দিরের ফাটলে উঠেছে অশ্বত্থ গাছ। আর মন্দিরের

ভেতরে চামচিকের বাসা; মেঝেতে চামচিকের বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের যাতায়াত নেই।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের লোকজন হঠাৎ মন্দিরে শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলো। মন্দিরে শাঁখ বাজছে ভোঁ ভোঁ করে। গ্রামের লোকেরা মনে করলো, হয়তো কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে। ছেলে বুড়ো সবাই দৌড়ে মন্দিরের কাছে এসে হাজির হলো। ওরা দেখতে পেলো, পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা নেই, মন্দির মার্জনা নেই—চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে চাম চকার বিষ্ঠা।"

হৃদয়মন্দিরে মাধবকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে, ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকলে কোন কাজ হবে না। আগে চাই চিত্তশুদ্ধি। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না।

চিত্তশুদ্ধি হলে ভক্তিপথে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হলে, তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগলে, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ইন্দ্রিয় সংযম হতে থাকে। পরমহংসদেব গল্পচ্ছলে বললেন, "যদি কারো পুত্রশোক হয়, সেদিন কি সে কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সেকি লোকের সামনে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না সুখ সম্ভোগ করতে পারে? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তাহলে সেকি আর অন্ধকারে থাকতে পারে? যে ভক্ত আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো—উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ আর শীতল—সে আলোতে ভক্তের হৃদয় শান্ত হয়, ভক্ত অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে।"

আমরা ভারতবাসী হিন্দুগণ তেত্রিশকোটি দেব-দেবীর উপাসক। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? যার যার বিশ্বাস অনুযায়ী এগিয়ে গেলেই হলো। আবার একটি সরস জোরালো উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, "কোলকাতা শহরে হাজার হাজার ডাক বাক্স আছে। চিঠি বড় পোস্ট অফিসেই ফেল আর ছোট ডাক বাক্সেই ফেল, ঠিকানা যদি ঠিক ঠিক লেখা থাকে, চিঠি যথাস্থানে গিয়ে পৌছুবেই।"

আমার চাই ঈশ্বরের ঠিকানা। ভক্তি-প্রেম মিশিয়ে ঈশ্বরের ঠিকানা ঠিক ঠিক লিখতে পারলে, যে-কোন ডাক-বাক্সেই ফেলি না কেন, অর্থাৎ আমি যে পথ দিয়েই যাইনা কেন, আমার অন্তরের আকুল আর্তি তাঁর কাছে পৌছাবেই।

॥ দশ ॥

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? এ প্রশ্ন সব ধর্ম জিজ্ঞাসু মানুষের মনে। সাকারভাবে উপাসনা করে ঈশ্বরলাভ করা যায়, না নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করে ঈশ্বরলাভ সম্ভব—এটিও একটি চিরন্তন প্রশ্ন।

আমাদের ধর্মগ্রন্থে ব্রহ্মকে 'ক্ষর' বা সগুণ এবং 'অক্ষর' বা নির্গুণও বলা হয়েছে। ব্রহ্ম ক্ষররূপে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টি করে ব্রহ্ম জগৎ থেকে পৃথক নন। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' অর্থাৎ ব্রহ্মই সব হয়েছেন।

আবার ব্রহ্ম তো কেবল জীবরূপেই প্রকাশিত নন। গীতার দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' অর্থাৎ 'আমি (ঈশ্বর) আমার একাংশদ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ করে আছি।' অক্ষর ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। কোন লক্ষণদ্বারা এর বর্ণনা করা যায় না।

ঈশ্বর সাকারও বটেন আবার নিরাকারও বটেন। ভক্তের কাছে তিনি সাকার আবার জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন যে, আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালে যে-কোন ধর্মের ভিতর দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বর দর্শন করতে পারেন, শাক্তরাও পারেন, বেদান্তবাদীরাও পারেন, আবার মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টানরাও পারেন। চাই আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

কেউ কেউ ধর্ম নিয়ে ঝগড়া করেন—এরা ধর্মের ভিতরে প্রবেশ করেন না। কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করলে কিছুই হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শক্তিস্বরূপা মা কালীর আরাধনা না করলে কিছুই হবে না। অনেক গোঁড়া খ্রীষ্টান, মুসলমান কিংবা হিন্দুদেরও একই রকম অন্ধ বিশ্বাস। এরা সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেন—সত্যি সত্যি ঈশ্বরের কথা বলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে এসব বুদ্ধির নাম হচ্ছে 'মতুয়ার বুদ্ধি' অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক আছে আর সবার ধর্মই মিথ্যা। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়েই পৌছানো যায়। তাই রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যত মত তত পথ।'

কেউ কেউ বলেন, ঈশ্বর সাকার—তিনি নিরাকার নন। এই নিয়েও আবার

তুমুল তর্ক। কিন্তু যিনি সত্যি সত্যি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, তিনি ঠিক জানেন যে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকারও।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যিনি যতটুকু বুঝেছেন তিনি সেভাবেই তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যেকের অভিমতই সত্য, কিন্তু খণ্ডিত। তাদের অভিমত থেকে পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। রামকৃষ্ণদেব এক গল্প বলে বুঝালেন কথাটা।

"কতকগুলো অন্ধলোক একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বললো, 'এ জানোয়ারটার নাম হাতি। অন্ধদের জিজ্ঞাসা করা হলো, হাতিটা কি রকম? তারা হাতির গা স্পর্শ করতে লাগলো। একজন অন্ধ বললো, 'হাতিটা একটা থামের মত।' সে অন্ধটি কেবল হাতির পা স্পর্শ করেছিল। আরেকজন অন্ধ বললো, 'হাতিটা একটা কুলোর মত।' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল।"

আরেকটি রসাশ্রিত গল্পের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। গল্পটি হলো:

"একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বললো, 'গাছতলায় আমি সুন্দর একটি লাল রঙের গিরগিটি দেখে এলুম।'

আরেকজন বললো, 'আমি তোমার আগে সেই গাছতলায় গিয়েছিলাম—আমিও সেই গিরগিটিটিকে দেখেছি। সেটি লাল হবে কেন? সেটি সবুজ—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

আরেকজন বললো, 'আমিও সেই গিরগিটিটিকে দেখেছি। তোমাদের আগে আমি সেই গাছতলায় গিয়েছিলুম। গিরগিটিটি লালও নয়, সবুজও নয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি সেটি নীল।'

আরেকজন ছিল; সে বললো, 'সেটির রঙ হলুদ।'

শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। সবারই ধারণা—তার দেখাটাই ঠিক।

একজন সাধু সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের ঝগড়া দেখে সাধুটি জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কি?' সাধুটি সব বিবরণ শুনে বললো, 'আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি। আমি ঐ গিরগিটিটিকে সব সময় দেখতে পাই। তোমাদের প্রত্যেকের কথাই সত্য ঐ গিরগিটিটি কখনো সবুজ, কখনো নীল এইরূপ নানা রঙ্ ধারণ করে। আবার কখনো দেখি, একেবারে কোন রঙ্ নেই। নির্গুণ।"

ছোট একটি গল্প। কিন্তু ইঙ্গিতটি কত গভীরে। ঈশ্বর সাকার আবার

নিরাকারও। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়। চৈতন্যদেবের ন্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মানুষের দেহ ধারণ করে আসেন একথা সত্য। ভক্তের প্রার্থনা অনুযায়ী নানারূপ ধরে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—এও সত্য।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যেন অনন্ত সাগরের মত। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় সাগরের জল যেমন স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়, নানা আকার ধারণ করে, তেমনি ভক্তি হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। পরমহংসদেব বলেন যে, ভক্তের জন্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সাকার মূর্তি ধারণ করেন।

রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বললেন, "আমরা ভগবতীর মূর্তি দেখি। তিনি দশপ্রহরণধারিণী। তিনি একদিকে যেমন ঐশ্বর্যশালিনী, অপর দিকে দুঃখদুরিত-দলনী। আমরা তাঁর আরাধনা করি। তাঁকে আরাধনা করতে করতে আমরা ধ্যেয়কে আরও ছোট করে আনলাম। আরাধনা করলাম ষড়ভুজা জগদ্ধাত্রীর। তারপর কল্পনা করলাম চতুর্ভুজা কালীকে। চতুর্ভুজা কালী থেকে কল্পনা করলাম দ্বিভুজ কৃষ্ণকে। কৃষ্ণকে আবার কল্পনা করি কচি নিষ্পাপ শিশু বালগোপালরূপে। বালগোপাল থেকে কমিয়ে আনলাম শিবলিঙ্গে। শেষ পর্যন্ত আরও ছোট করে শালগ্রাম শিলায়। তারপর নিরাকার ব্রহ্মে।"

তাই যিনিই সাকার তিনিই আবার নিরাকার।

আমরা যতই ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবো, ততই দেখতে পাবো যে, ঈশ্বরের নাম বা রূপ বলে কিছু নেই। দূর থেকে আকাশকে নীল দেখায়, কিন্তু আকাশের কোন রং নেই। দূরে আছি বলে 'কালী' শ্যামবর্ণ। তাইতো আমরা শ্যামা মায়ের আরাধনা করি। তিনি সগুণ। কাছে এলে দেখবো তিনিই আবার নির্গুণ।

ভক্তিবাদ এবং জ্ঞানবাদ সম্পর্কে চমকপ্রদ একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব। গল্পটি হলো :

"তিনবন্ধু এক বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন সেখানে একটি বাঘ এসে উপস্থিত হলো।

একজন বললো, 'ভাই, আমরা মারা গেলুম।'

আরেকজন বললো, 'কেন? মারা যাবো কেন? এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।'

অপরজন বললো, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি লাভ? এস, আমরা ঐ গাছে উঠে পড়ি।'

যে লোকটি বললো, 'আমরা মারা গেলুম'—সে জানে না যে, ঈশ্বর একজন রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললো. 'এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি'—সে জ্ঞানী। সে জানে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। আর যে বললো, 'তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, আমরা গাছে উঠি'—তার ভেতর প্রেম জন্মেছে। সে ঈশ্বরকে ভালবাসে। তাই তার ইচ্ছা যে, ঈশ্বরের পায়ে যেন কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।"

কবীর বলতেন, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো—দোনো পাল্লা ভারী।'

ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার। আবার জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "আগে কোলকাতায় যাও—তারপর তো তুমি জানতে পারবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এশিয়াটিক সোসাইটি, আর কোনখানেইবা বাঙাল ব্যাঙ্ক। খড়দার বামুন পাড়ায় যেতে হলে আগে তো খড়দায় যাও।"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে তবে জানা যায় যে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকারও।

॥ এগারো ॥

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে বলি ব্রহ্ম। বলি পুরুষ। যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করেন তখন তাঁকে বলি শক্তি। বলি প্রকৃতি। পরমব্রহ্মের দুইরূপ—পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, "ছাদে উঠতে হবে—সব সিঁড়ি একে একে ডিঙিয়ে তবে ছাদে ওঠা যায়। কিন্তু ছাদের উপর গিয়ে দেখা যাবে। যে জিনিস দিয়ে ছাদ তৈরি হয়েছে, সে জিনিস দিয়ে সিঁড়িও তৈরি হয়েছে। যিনি পরমব্রহ্ম, তিনি আবার জীবজগৎও সৃষ্টি করেছেন।"

পুরুষ অকর্তা। প্রকৃতির কাজ তিনি সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দেখছেন। প্রকৃতিরও সাধ্য নেই, পুরুষ ছাড়া কাজ করতে পারে।

সংসার জুড়ে চলেছে প্রকৃতির নিত্য-লীলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি পুরুষ থেকে পৃথক নয়—যেমন ব্রহ্ম আর শক্তিতে কোন প্রভেদ নেই। অগ্নির আছে দাহিকাশক্তি, আবার জলের আছে হিমশক্তি। আগুনকে ভাবলে আগুনের দাহিকাশক্তির কথাও ভাবতে হয়। সাপ আর সাপের তির্যক গতি। সাপের ভিতরে বিষ আছে, কিন্তু তাতে সাপের কিছুই হয় না। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত।

পরমব্রহ্ম যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাঁকে বলা হয় আদ্যাশক্তি। চণ্ডীতে দেখতে পাই দেবতারা সেই আদ্যাশক্তিরই স্তব করেছিলেন :

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকাস্থিতা॥
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব মাত্বং সাবিত্রীত্বং দেবজননীপরা॥
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথাসংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না।

'দুধ কেমন? না ধোবো ধোবো।' দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব চমৎকার এক দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, "ওই যে দেখনি, বে-বাড়িতে! কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে বাড়িময় ছুটোছুটি করছেন : একবার এখানে, আরেকবার ওখানে। একাজটা হলো কিনা, ও কাজটা করলো কিনা—এসব দেখছেন-শুনছেন। বাড়িতে যত মেয়েছেলে আসছে, সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা করছেন। আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন, এটা এই রকম করা হলো, আর ওটা ঐরকম! কর্তা কিন্তু তামাক টানতে টানতে সব শুনছেন আর 'হুঁ হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন।"

কঠিন তত্ত্ব, অথচ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কি রসস্নিগ্ধ করে বললেন যে, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলে, অপরটিকেও মানতে হয়।

আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁর নামই কালী। আবার কালীই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজই করছেন না—এই সব কথা যখন ভাবি,

তখন তিনি ব্রহ্ম। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন—তখন তিনি আদ্যাশক্তি—কালী।

আবার অপূর্ব উদাহরণ দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, "যেমন জল—ওয়াটার—পানি। এক পুকুরে তিনচার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়। তারা বলে জল। অন্যঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে পানি। আরেক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তারা বলে ওয়াটার। তিনই এক, কেবল নামে তফাৎ।"

ব্রহ্মকে কেউ বলেন 'আল্লা', কেউ বলেন 'গড্', আবার কেউ বলেন 'কালী'। আবার অনেকে বলেন রাম, হরি, যীশু, দুর্গা ইত্যাদি। আবার স্বয়ং কালীরই বিচিত্র লীলা বোঝা ভার! তিনি কখনো মহাকালী, কখনো নিত্যকালী, কখনো শ্মশানকালী, কখনো রক্ষাকালী, আবার কখনো শ্যামাকালী। মহাকালীর কথা তন্ত্রে উল্লেখ আছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে, যখন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী এগুলো সৃষ্টি হয়নি—সর্বদিকে বিরাজ করছিলো নিবিড় অন্ধকার, তখন মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর যেন কিছুটা কোমল ভাব—তিনি বরাভয়দায়িনী। ঘরে ঘরে তাঁরই পুজো হয়ে থাকে। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হয়—যখন পৃথিবীতে দেখা দেয় বিপর্যয়—তখন রক্ষাকালীর পুজো করা হয়। শ্মশানকালীর যেন সংহার মূর্তি। শব, ডাকিনী-যোগিনী নিয়ে তিনি শ্মশান বিচারিণী। গলায় মুণ্ডমালা, কোমরে নরহস্তের কোমর-বন্দ। যখন জগতের বিনাশ অনিবার্য, মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তিনি সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তিনি মায়াময় জগৎসংসার নিয়ে খেলা করেন। 'বুড়ীকে' আগে-ভাগে ছুঁয়ে দিলে খেলা হয় না। সবাই যদি আগে-ভাগে বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে তবে কেমন করে খেলা হয়? তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা সংসার-চক্রে ঘুর-পাক খাচ্ছি, আবার তাঁর দয়াতেই আমরা বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পাই।

ভক্তের জন্য ঈশ্বর সাকার। যাঁরা জ্ঞানী—যাঁরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে মনে করেন, তাঁদের জন্য তিনি নিরাকার। ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী নেতি, নেতি করে বিচার করে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যান। বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ।

যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগেই এই জগৎলীলা চলেছে। পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করে যাচ্ছেন—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির অর্থ হলো, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ। এক

সচ্চিদানন্দ—অথচ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ। তাই হিন্দুদের নানা দেব-দেবী, নানা মূর্তি, নানা রূপ। যেখানেই কর্ম, সেখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির হলেও জল—তরঙ্গ, বুদবুদ হলেও জল। তাই যিনি সচ্চিদানন্দ—তিনিই আদ্যাশক্তি।

কালী কে? যিনি মহাকালের সঙ্গে রমণ করেন তিনিই কালী। কালী সাকার আবার নিরাকারও। রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, একটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন—তিনি কমন! একটি সুন্দর গল্পের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব এই কথাটাই বুঝিয়ে দিলেন। গল্পটি হলো:

"কোন এক রাজা এক যোগীকে বলেছিলেন, 'আমাকে এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে।' যোগী উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।' একটু বাদেই সেখানে এক যাদুকর এসে হাজির হলো। সে এসে রাজার সামনে যাদুর খেলা দেখাতে লাগলো। যাদুকর রাজার সামনে দুটো আঙ্গুল ঘোরাতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'রাজা এই দেখ, এই দেখ।' রাজা অবাক হয়ে দেখছেন। খানিকক্ষণ বাদেই তিনি দেখতে পেলেন যাদুকরের দুটো আঙ্গুল যেন একটা হয়ে গেছে।"

এর অর্থ ব্যাখ্যা করে রামকৃষ্ণদেব বললেন যে, ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথমে দুটো আলাদা সত্তা বলে মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে সবই এক দেখতে পায়। যে একের আর দুই বলে কিছু নেই। অদ্বৈতম্। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি।

যতক্ষণ 'আমি,' 'তুমি' বোধ আছে, ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করছি কিংবা ধ্যান করছি—এ বোধ আসবে। তুমি প্রভু—আমি তোমার দাস; তুমি পূর্ণ—আমি তোমার অংশ; তুমি মা—আমি তোমার সন্তান—এ বোধ থাকবে। এই ভেদবোধ ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। যতক্ষণ এই ভেদবোধ থাকবে, ততক্ষণ শক্তিকে স্বীকার করতেই হয়। যতক্ষণ 'আমি' বোধ আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলার উপায় নেই। তখন সগুণ ব্রহ্মকে স্বীকার করতেই হয়। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

একই ব্রহ্মের দুই রূপ—সাকার আর নিরাকার। একটি রসস্নিগ্ধ গল্পের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন তত্ত্বটা। গল্পটা হলো:

"এক সন্ন্যাসী পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে তার সন্দেহ হলো—জগন্নাথদেব সাকার না নিরাকার। তার হাতে ছিল এক দণ্ড। সেই দণ্ড দিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন দণ্ডটি জগন্নাথদেবের গায়ে লাগে কিনা। একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় সন্ন্যাসী দেখলেন যে, দণ্ডটি জগন্নাথদেবের মূর্তি স্পর্শ করে নি। সন্ন্যাসী তাকিয়ে দেখলেন

যে, মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি নেই। আবার দণ্ডটি এধার থেকে ওধারে নিয়ে যাবার সময়ে বিগ্রহের গায়ে গিয়ে ঠেকলো। তখন সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন যে, ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকারও বটেন।"

যিনি সাকার তিনিই আবার নিরাকার—এ ধারণা করা খুবই শক্ত ব্যাপার। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার হবেন কি করে? এ সন্দেহ মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। আবার যদি সাকার হন, তবে নানারূপ কেন? সত্যি সত্যি ঈশ্বর দর্শন না হলে এসব তত্ত্ব সহজে বোঝা যায় না। সাধকের কাছে তিনি নানা-ভাবে নানামূর্তিতে দেখা দেন। এ সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিচিত্র এক কথার নকৃশা তৈরি করলেন।

"একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসতো। কেউ কাপড় রঙ করাতে আসলে সেই লোকটি জিজ্ঞেস করতো, 'তুমি কোন রঙে কাপড় ছোপাতে চাও?'

একজন হয়তো বললো, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানা চুবিয়ে তুলে বলতো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপানো কাপড়।' আরেকজন হয়তো বললো, 'আমার কাপড় হলুদ রঙে ছোপানো চাই।' আরেকজন বললো, 'আমারটা চাই নীল রঙের।' সেই লোকটি গামলায় কাপড় চুবিয়ে যার যার ইচ্ছা অনুযায়ী লাল, নীল, সবুজ রঙে কাপড় রাঙিয়ে দিতো।

একজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে এই আশ্চর্যজনক ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। তাকে দেখে রঙওয়ালা জিজ্ঞেস করলো, 'কিহে, তোমার কাপড় কোন রঙে ছোপাতে হবে?'

তখন সেই লোকটি বললো, 'ভাই, তুমি যে রঙে রঞ্জিত হয়েছো, আমাকেও সেই রঙে রঙিয়ে দাও।"

যিনি সত্যি সত্যি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন তিনিই শুধু বলতে পারেন ঈশ্বরের স্বরূপ কি। তিনিই জানেন যে, ঈশ্বর নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার তিনিই নির্গুণ। তিনি সাকার আবার তিনিই নিরাকার।

॥ বারো ॥

ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পাঠ করে, আবার কেউ দলিল জাল করে। অথচ প্রদীপ নির্লিপ্ত।

যেমন বায়ু। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ সবই বায়ু বহন করে নিয়ে আসে। অথচ বায়ু উদাসীন।

যেমন সূর্য। শিষ্টের উপর যেমন আলো দেয়, আবার দুষ্টের উপরও তেমনি আলো দেয়। অথচ সূর্য নির্বিকার।

ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব এক রসস্নিগ্ধ গল্প বলে অপূর্ব ভাবরসের সৃষ্টি করলেন। গল্পটি হলো :

"ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন। সেখানে গোপীরাও এসে হাজির হলো। তারাও যমুনা পার হবে। কিন্তু পারাপারের খেয়া নেই।

'গোপীরা ব্যাসদেবকে বললো, 'ঠাকুর, এখন কি উপায়!'

ব্যাসদেব বললেন, 'আচ্ছা, তোদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে। তোদের ভাঁড়ে কিছু আছে?'

গোপীদের কাছে ক্ষীর, মাখন ইত্যাদি অনেক কিছু ছিল, সবই ব্যাসদেব ভক্ষণ করলেন।

এবার গোপীরা জিজ্ঞেস করলো, 'ঠাকুর, অনেক তো খাওয়া হলো, এবার আমাদের ওপারে যাবার কি ব্যবস্থা করলেন?'

ব্যাসদেব তখন যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'হে যমুনে, আমি যদি আজ কিছুই না খেয়ে থাকি, তবে তোমার জল দু'ভাগ হয়ে যাক। আর আমরা সবাই সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাই।'

বলতে না বলতে যমুনার জল দু'ধারে সরে গেল। গোপীরা তো অবাক! ভাবতে লাগলো, উনি তো এইমাত্র এত খেলেন আর বলছেন কিনা, 'আমি যদি কিছুই না খেয়ে থাকি।"

কিন্তু আমি খাই না। হৃদয় মধ্যে যিনি নারায়ণ আছেন তিনিই খান।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। প্রথমে অবশ্য তাঁর ভেদবুদ্ধি ছিল। একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করে উঠেছেন, সেই সময়ে একজন চণ্ডাল মাংসের ভাঁড় নিয়ে

যাচ্ছিলো। হঠাৎ শঙ্করাচার্যের সাথে চণ্ডালের ধাক্কা লেগে গেল। অমনি শঙ্করাচার্য রেগে গিয়ে বললেন, 'এই, তুই আমাকে ছুঁয়ে দিলি?'

চণ্ডালের জ্ঞানও কিন্তু কম নয়। সে বলে উঠলো, 'ঠাকুর, আমি তোমাকে ছুঁইনি, আবার তুমিও আমাকে ছোঁওনি। যিনি শুদ্ধ আত্মা—তিনি শরীর নন। পঞ্চভূত নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্বও নন।'

তখন শঙ্করাচার্যের জ্ঞান হলো।

যাঁদের চৈতন্য হয়েছ তাঁরা দেখেন ঈশ্বরই সব হয়েছেন। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি চমকপ্রদ গল্প বললেন :

"এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী ভিক্ষা করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখে যে, একজন জমিদার একটা লোককে ধরে বেদম মারছে। সাধুটির বড় দয়া হলো। সে জমিদারকে মারতে বারণ করলো। জমিদার তখন রেগে গিয়ে সাধুটিকে ধরে মারতে লাগলো। সাধুটিকে এমন প্রহার করলো যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়লো। একজন গিয়ে মঠে খবর দিল, 'তোমাদের এক সাধুকে ধরে জমিদার খুব মেরেছে, সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।'

মঠের সাধুরা দৌড়ে গিয়ে পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠে এনে শুশ্রূষা করতে লাগলো। সাধুর একটু জ্ঞান হয়েছে মনে করে একজনে মুখে একটু দুধ দিল। দুধ খেয়ে সাধু চোখ মেলে দেখতে লাগলো। একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মহারাজ, আপনাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে বলতে পারেন?'

সাধু ধীরে ধীরে বললো, 'ভাই, যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

ঈশ্বরই সব হয়েছেন। তিনিই আমাদের দুঃখ দিচ্ছেন। আবার তিনিই আমাদের আনন্দ দিচ্ছেন। পরমতম আনন্দের সন্ধান আমরা তাঁর মধ্যেই পাবো।

শক্তির অপর নাম মহামায়া। আবার এই মহামায়াই মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'জজের চেয়ে পেয়াদার ক্ষমতা বেশি। পেয়াদা পরোয়না জারী না করলে জজসাহেবের সাধ্য নেই যে, বিচার করেন।'

মহামায়াই মানুষকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। জগৎ সংসারকে আচ্ছন্ন করে রেখে তিনি একরূপ খেলা খেলিয়ে নিচ্ছেন। মানুষ মায়ামোহে সব কিছু ভুলে যায়। কিন্তু যাঁদের জ্ঞান হয়েছে, তাঁরা মায়ার ভেলকিতে ভোলেন না। মানুষ হচ্ছে গুটিপোকার মত। গুটিপোকা যেমন ইচ্ছা করলে তার ঘর কেটে

বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু নিজে ঘর তৈরি করেছে বলে সে ঘর ছেড়ে আসতে চায় না। শেষে সেই ঘরেই তার মৃত্যু হয়।

মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন—এ সংসারে এত দুঃখ কেন? এ সংসার হচ্ছে ঈশ্বরের লীলা খেলা। দুঃখ, পাপ এসব না থাকলে ঈশ্বরের লীলা চলে না। 'চোর চোর' খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার শুরুতেই বুড়ীকে ছুঁয়ে দিলে বুড়ী খুশি হয় না। ঈশ্বররূপ বুড়ীর ইচ্ছা যে, খেলাটা কিছুক্ষণ চলুক।

আমরা মায়ামোহে আবদ্ধ রয়েছি বলেই তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি আমাদের জীবনকে জর্জরিত করে তুলছে। 'আমার বাড়ি, 'আমার গাড়ি' বলে আমরা কতই না গর্ব অনুভব করি। কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করি না যে, এ আমার সম্পত্তি নয়—সবই ঈশ্বরের সম্পত্তি। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব সুন্দর এক রসোক্তি করলেন :

"ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন, যখন দুই ভাই জমি বখরা করে আর দড়ি মেপে বলে—এদিকটা আমার আর ওদিকটা তোমার।" ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন যে, আমার জগৎ—অথচ এর খানিকটা মাটি নিয়ে এরা পরস্পর ঝগড়া করছে।

'ঈশ্বর আরেকবার হাসেন। ছেলের মরণাপন্ন অসুখ। মা কাঁদছেন। বৈদ্য এসে বলছে—ভয় কি মা, আমি আছি। আমি ওকে ভাল করে তুলবো।'

"বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে?"

জগৎসংসারে চলেছে মহামায়ার লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী এবং লীলাময়ী। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি জগৎসংসার নিয়ে খেলা করেন। এই সংসারে থেকে মানুষ সহজে বুড়ী ছুঁতে পারে না। বুড়ীকে আগে-ভাগে ছুঁয়ে দিলে যেমন খেলা চলে না, তেমনি মহামায়ার ইচ্ছা যে, জগৎসংসারে মানুষ কিছুদিন দৌড়া-দৌড়ি করুক—খেলুক। তাঁর ইচ্ছা হলেই মানুষ বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়ে হলো—তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব উপমা দিয়ে বললেন, "যেন পানা-ঢাকা পুকুর। পানাঢাকা পুকুরে ঢিল মারলে সামান্য জল দেখা যায়। আবার পরক্ষণেই পানাগুলো নাচতে নাচতে জল ঢেকে ফেলে। তবে যদি পানাগুলোকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে বাঁশ ঠেলে পানাগুলো আর ভিড়তে পারে না।"

বিবেক বৈরাগ্যরূপ বাঁশ দিয়ে বেড়া দিতে হবে যাতে মায়া আর ভিতরে প্রবেশ

করতে না পারে। জ্ঞানীকে দেখে মায়া কিভাবে পালিয়ে যায় সে সম্পর্কে রসাপ্লুত এক কাহিনী বললেন রামকৃষ্ণদেব :

"এক গুরু শিষ্যবাড়ি যাচ্ছেন। সঙ্গে চাকরবাকর কেউ নেই। রাস্তায় একটা লোককে দেখতে পেয়ে গুরু বললেন, ওরে, আমার সঙ্গে যাবি? ভাল খেতে পারবি আর অনেক আদরে থাকবি, চল।

"লোকটা ছিল জাতিতে মুচি। আমতা আমতা করে বললো, ঠাকুর, আমি নীচ জাত, কেমন করে আপনার চাকর হই?

"গুরু তাকে প্রশ্রয় দিয়ে বললেন,, তোর কোন ভয় নেই। কাউকে তুই নিজের পরিচয় দিবি না। কারো সঙ্গে কথা বলবি না।

"নিশ্চিন্ত হয়ে রাজী হলো মুচি। সন্ধ্যার সময়ে শিষ্যবাড়িতে সন্ধ্যা-আহ্নিক করছেন গুরু, এমন সময়ে আরেকজন ব্রাহ্মণ এসে সেখানে উপস্থিত হলো। সামনে চাকরটাকে দেখতে পেয়ে ব্রাহ্মণ বললো, 'আমার জুতো জোড়াটা এনে দেতো।

চাকর কথ. বললো না। আবার তাড়া দিল ব্রাহ্মণ। তাতেও চাকর চুপ করে রইলো।

"কিরে, কথা বলছিস না কেন? ওঠ?—বললো ব্রাহ্মণ। তবুও চাকরটা নড়লো না।

তখন ধমকে উঠলো ব্রাহ্মণ। বললো, আরে বেটা, তুই ব্রাহ্মণের কথা শুনছিস না? তুই কি জাত? মুচি নাকি?

"চাকরটি তখন ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললো, ঠাকুর মশাইগো! আমাকে চিনে ফেলেছে। আমি এখন পালাই।

"মায়া পালিয়ে গেল। প্রশ্রয় দিয়ে গুরু মায়াকে স্ববশে রাখার চেষ্টা করে ছিলেন। জাত গোপন করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানীকে দেখে মায়া পালিয়ে গেল।"

মায়ার ভেল্‌কি ধরে ফেললে মায়া পালিয়ে যায়। সে সম্পর্কে আরেকটি অভিনব ছোট্ট গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"হরিদাস বাঘের ছাল পরে ছেলেদের ভয় দেখাচ্ছিলো। একটি সাহসী ছেলে এসে বললো, তোমাকে আমি চিনে ফেলছি। তুমি আমাদের হরে।

"হরিদাস হেসে সেখান থেকে চলে গেল। আর ভয় দেখানো হলো না। মায়া পালিয়ে গেল।"

মায়া দেখতে দেয় না ঈশ্বরকে। মাথার উপরে ছাদ থাকলে আমরা কি করে

সূর্যকে দেখতে পাবো ? মায়ার ছাদ তুলে না ফেললে আমরা জ্ঞানসূর্যকে দেখতে পাবো না। মায়াকে প্রশ্রয় দিলেই একেবারে অক্টোপাশের মত আমাদের জাপটে ধরে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য চাই আকুল প্রার্থনা। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি রসাশ্রিত ঘরোয়া ছবি আঁকলেন :

"এক ভদ্রলোক কুকুর পুষেছেন। কুকুরটাকে তিনি খুব বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন। দিন-রাত কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বসে থাকেন—আদর করেন।

"কুকুরকে এত আদর দিতে নেই—একজন এসে বলে গেল। সে আরও বললো, কুকুর হচ্ছে পশুর জাত। কোনদিন হয়তো আদর ভুলে ফট করে কামড়ে দেবে তার ঠিক কি !

"ভদ্রলোকের চৈতন্য হলো। সত্যিই তো ! জোর করে কুকুরটাকে একদিন নামিয়ে দিলেন কোল থেকে। কিন্তু কুকুর তা শুনবে কেন ? দৌড়ে এসে আবার উঠতে চায় মনিবের কোলে। নামিয়ে দিলেও আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে পালিয়ে গেলে কুকুরটাও পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে।

"এখন উপায় কি ? প্রহার। কুকুরের প্রহার আড়াই প্রহর। ভুলে গিয়ে কুকুরটি আবার কোলে উঠতে চায়। ভদ্রলোক অনেককাল আদর করে কোলে তুলে নিয়েছেন। এখন না চাইল কুকুর ছাড়বে কেন ? তাই চাই ঘন ঘন প্রহার। তাহলে সে আর আসবে না।"

এতদিন মায়ামোহে কামিনীকাঞ্চনকে প্রশ্রয় দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছি। এখন হঠাৎ করে নিষেধ করলে শুনবে তার কেন ? চাই অনবরত প্রহার। চাই দৃঢ় আত্মসংযম।

॥ তেরো ॥

অহংকারই জীবের মায়া। এই অহংকারই যেন জীবের চতুর্দিকে একটা আবরণ রচনা করে রেখেছে। আমি মরলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় আমি—অকর্তা এই বোধ জন্মায় তাহলে সে ব্যক্তি জীবনমুক্ত হয়ে যেতে পারে। তার আর কোন চিন্তা থাকে না।

কিন্তু আমরা সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। মায়ার বন্ধন কাটাতে চাইলেও পারছি কোথায় ? আমরা যেন লেজে ইট বাঁধা নেউলের মত।

লেজে ইট বাঁধা নেউলের গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"দেয়ালের গর্তে নিভৃত জায়গায় দিব্যি আরামে ছিল একটা নেউল। কিন্তু একটা দুষ্টু ছেলে নেউলের লেজে বেঁধে দিয়েছিলো একটা ইট। যতই চেষ্টা করে নেউলটি নিভৃত গর্তটিতে ফিরে যেত, কিন্তু ইঁটের টানে তাকে বার বার বেরিয়ে আসতে হয় গর্ত থেকে।"

দুষ্টু ছেলে আর কেউ নয়—সেই মায়া। বিষয় চিন্তাও তেমনি। যতই আমাদের মন ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হতে চায় ততই বিষয়চিন্তা যেন আমাদের টেনে বার করে দেয়। ঘটায় যোগভ্রংশ।

মায়া কি সহজে যায়? সংস্কার দোষে মায়া আবার অনেক সময় ঘুরেফিরে আসে। মায়ার সংসারে থেকে মায়াকেই আমাদের সত্য বলে মনে হয়। রামকৃষ্ণদেব সুন্দর উপমা দিয়ে বোঝালেন, "এক রাজার ছেলে পূর্ব জন্মে ধোপার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল। একদিন খেলার সময়ে সে খেলার সাথীদের ডেকে বললো, 'এখন অন্য খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচা খেলা খেল।"

তেমনি ঘুরে ঘুরে আমরা মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। আরেকটি অপূর্ব উদাহরণ দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, "এক মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বললো, 'মা যতই সাজো আর গোজো, দিন দুই-তিন পরে তোমাকে টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে।"

তেমনি আমাদের মাতাল হতে হবে ঈশ্বরপ্রেমে। তাহলে দেখবো যে, সংসারে সব কিছুই অসার। দেখবো, সব কিছুই কাঠ, খড়, মাটি আর শোলা। ঈশ্বরই বস্তু আর সবই অবস্তু।

আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র—যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, মধ্যে রয়েছেন মায়ারূপ সীতাদেবী। এত কাছে থেকেও লক্ষ্মণরূপ জীব মায়ারূপ সীতাদেবীর জন্য ভগবান-রূপ রামচন্দ্রকে দেখতে পাননি। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে রয়েছেন আমাদের। তবু মোহমায়া আবরণের জন্য আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আবার রসস্নিগ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব: "একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা গান শুনতে এসেছিল। কিন্তু যাত্রা গান আরম্ভ হতে দেরি দেখে লোকটি মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম থেকে উঠলো, তখন গান শেষ হয়ে গেছে।"

আমরা যখন যাত্রা গান শুনতে এসেছি, ধৈর্য ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে

হবে সেই শুভক্ষণটির জন্য। কিন্তু মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হলে আমরা কি করে শুনবো তাঁর অপূর্ব সঙ্গীত?

ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে এক গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, সেজন্য যত রাজ্যের কাক এসে চিলকে ঘিরে ধরলো। যেদিকে চিল মাছ মুখে নিয়ে যায়, অমনি কাকগুলো সেদিকে ছুটতে থাকে। চিলের মুখ থেকে মাছটা হঠাৎ পড়ে গেল, তখন কাকগুলো আর চিলের দিকে গেল না।

মাছ হচ্ছে ভোগের বস্তু। কাকগুলো হলো আমাদের ভাবনা-চিন্তা। যেখানেই ভোগ সেখানেই চিন্তা-ভাবনা। ভোগ শেষ হয়ে গেলেই শান্তি। রামকৃষ্ণদেব একটি সরস উদাহরণ দিয়ে বললেন, "আজ বাগবাজারের পুল পেরিয়ে এলাম। কত বাঁধনই না দিয়েছে। অনেক বাঁধন—অনেক শিকল। একটা বাঁধন ছিঁড়লে পুলের কিছুই হবে না। অন্য বাঁধনগুলো টেনে রাখবে।"

সংসারীদের অনেক বন্ধন—অনেক নাগপাশ। ধীরে ধীরে সেই বন্ধনগুলো ছিন্ন করতে হবে।

সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর সংসার রেখেছেন। এটা তাঁর অভিপ্রেত। তাঁর মায়া। কামিনীকাঞ্চন দিয়ে তিনি সব ভুলিয়ে রেখেছেন। কেউ একবার যথার্থ ঈশ্বরানন্দ পেলে আর সংসার করতে চায় না। তখন সৃষ্টিও চলে না। পরমহংসদেব ছোট একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কথাটা। "চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। যাতে না ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, সেজন্য দোকানদাররা একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে দেয়। খই মুড়কি খেতে মিষ্টি লাগে। তাই ইঁদুরগুলো সারারাত কটর-মটর করে খই-মুড়কি খায়। চালের সন্ধান করে না।"

খই-মুড়কি খাওয়া মানে সংসারে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে মেতে থাকা। চালের সন্ধান হচ্ছে অমৃতের সন্ধান। আমরা সংসারে ইন্দ্রিয় সুখের লালসায় লিপ্ত হয়ে আছি। এই সুখ ত্যাগ করে আমরা কেন অমৃত সুখের সন্ধান করি না?

ছেলেরা যখন খেলায় মত্ত হয় তখন তারা মাকে চায় না। খেলা শেষ হলেই মায়ের কাছে ছুটে যেতে চায়। আমাদের এই সংসারের খেলা আর কতদিন চলবে? এই খেলা সাঙ্গ করে দিয়ে আমরা কেন মায়ের কাছে ছুটে যাবার জন্য পাগল হই না?

আমরা সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আছি বলে বুঝতে পারি না আমরা কতটা

নীচে নেমে যাচ্ছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, "কেল্লার ভিতরে যখন গাড়ি করে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন মনে হলো যেন সাধারণ রাস্তা দিয়েই এসেছি। তারপর দেখি যে, চারতলা নীচে এসে পড়েছি।"

যে নামতে থাকে, সে বুঝতে পারে না যে, সে নীচে নেমে যাচ্ছে। যাকে ভূতে পায়, সে বুঝতে পারে না যে, তাকে ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে, 'আমি বেশ আছি।"

ঈশ্বরের মায়াতে বিদ্যাও আছে। আবার অবিদ্যাও আছে। অবিদ্যা না থাকলে বিদ্যার মূল্য ঠিক বোঝা যায় না। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা আমরা বুঝবো কি করে? মানুষেয় মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি খারাপ জিনিস ঈশ্বরই দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এর উদ্দেশ্য হলে, তিনি মহৎলোক তৈরি করবেন বলে। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনিই ঈশ্বর লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেবের মতে পৃথিবীতে দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। তাই তিনি একদিন বললেন, "একটি তালুকের প্রজারা খুবই দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল। তখন গোলক চৌধুরীকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার নামে প্রজারা সব কাঁপতে লাগলো।"

সীতাদেবী বলেছিলেন, রাম। অযোধ্যায় যদি সব অট্টালিকা হতো তবে বেশ হতো। অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা এবং পুরনো।

উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন, সীতা! সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা করবে কি?

আমাদের মধ্যে দুঃখ, দৈন্য ও অভাববোধ হচ্ছে। এইগুলো ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। যিনি মানবজন্ম লাভ করেছেন তাকে কোন না কোনভাবে দুঃখ পেতেই হবে। সাহসিকতার সঙ্গে এগুলো আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। মনকে সমস্ত রকম দুঃখ, দৈন্য ও অভাব বোধের উর্ধ্বে তুলে এই জগৎসংসারকেই আনন্দধাম বলে মনে করতে হবে। মানবজন্ম লাভ করলে দুঃখ কেউ এড়াতে পারে না। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব ভীষ্মের শরশয্যার গল্প শোনালেন।

"ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে কাঁদছিলেন। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ মৃত্যু হবে বলে তিনি কাঁদছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না, কেন তিনি কাঁদছেন।

"ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি শ্রীভগবানের লীলা

কিছুই বুঝতে পারলুম না। হে কৃষ্ণ! তুমি এই পাণ্ডবদের সাথে সাথেই আছ, পদে পদে রক্ষা করছো, তবুও তাদের বিপদের শেষ নেই। আমি তোমার অপার লীলার কথা ভেবে কাঁদছি।"

সত্যিই তো ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার! তিনি স্বয়ং রক্ষাকর্তা হয়েও আমাদের বিপদের অন্ত নেই। তাই তো আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত :

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—বিপদে আমি না যেন করি ভয়। দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

॥ চৌদ্দ ॥

অনেকের ধারণা ঈশ্বরের আরাধনা করতে হলে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হবে। কিন্তু জগৎসংসার তো ঈশ্বর থেকে আলাদা নয়। তাই সংসারের বাইরে কোথায় খুঁজবো ঈশ্বরকে! তিনি তো সর্বত্র বিরাজিত। গুরু নানক একবার এক মসজিদের দিকে পদযুগল প্রসারিত করে শুয়েছিলেন। একজন আরবীয় ধর্মযাজক নানকের এই আচরণ দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। তুমি খোদার দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছ। গুরু নানক ধীর ও নম্র স্বরে বললেন, ভাই, খোদা যেদিকে নেই, দয়া করে আমার পা দুটো সেদিকে ঘুরিয়ে দাও। ধর্মযাজক রেগে গিয়ে নানকের পদযুগল বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিল। দেখতে না দেখতে মসজিদও বিপরীত দিকে ঘুরে গেল।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র ঈশ্বরের অবস্থিতি। তাই এই সংসারে থেকেই আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করবো। রামকৃষ্ণদেব এ সম্পর্কে শ্রীরামচন্দ্রের এক অনুপম কাহিনী বললেন :

"শ্রীরামচন্দ্রের যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হলো, তখন রাজা দশরথ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন বশিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হলেন। দশরথ বশিষ্ঠ মুনিকে বললেন, রাম সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে চায়। সে যাতে চলে না যায় একটু চেষ্টা করে দেখুন।

"বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন তিনি অচঞ্চলভাবে বসে আছেন।

তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সংসার ত্যাগ করতে চাও কেন? জগৎ-সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তুমি আমার সঙ্গে বিচার কর।

"তখন শ্রীরামচন্দ্রের উপলব্ধি হলো যে, পরমব্রহ্ম থেকেই জগৎসংসারের উৎপত্তি হয়েছে।'

জীবজগৎ কখনো ব্রহ্ম থেকে আলাদা হতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব সুন্দর আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, "যে জিনিস থেকে ঘোল, সে জিনিস থেকেই মাখন। তখন ঘোলেরই মাখন আর মাখনেরই ঘোল। অনেক পরিশ্রম করে মাখন তুললে দেখা যাবে যে, মাখন থাকলেও ঘোল আছে। যেখানে মাখন, সেখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলে, জীবজগৎও আছে।"

জীবজগৎকে বাদ দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্ধান করবো কোথায়? রামকৃষ্ণদেব বললেন, "তাহলে যে ওজনে কম পড়ে যাবে। বেলের বীচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।" আবার পরম পুরুষের অপূর্ব ঘরোয়া দৃষ্টান্ত। "একজন ভক্ত তার মাগ্‌কে বলেছিল, আমি সংসার ছেড়ে চললুম। সেই মাগ্‌ ছিল জ্ঞানী। তাই সে উত্তর দিলো, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও আর যদি হয়তো এই এক ঘরই ভাল।"

ঈশ্বরের কাজ বোঝায় কোন উপায় নেই। তিনিই সৃষ্টি করছেন। পালন করছেন আবার সংহারও করছেন। তিনি কেন সংহার করছেন তা জেনে আমাদের কি কাজ? আমাদের প্রার্থনা শুধু তাঁর পাদপদ্মে যেন আমাদের শুদ্ধা ভক্তি থাকে। মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। রামকৃষ্ণদেব একটি অপরূপ উপমা দিয়ে বললেন, "আমরা বাগানে আম খেতে এসেছি। বাগানে কত গাছ, কত ডালপালা, কত কোটি পাতা—এসব হিসাব করবার আমার দরকার কি? আমি আম খেতে এসেছি শুধু আম খেয়ে যাবো—ডালপালার হিসাবে আমার কাজ নেই।"

অবিদ্যাতে যদি মানুষকে অজ্ঞান করে রাখে, তবে তিনি অবিদ্যা কেন রেখেছেন? রামকৃষ্ণদেব বললেন, "এ তাঁর লীলা। অন্ধকার না থাকলে আমরা আলোর মহিমা বুঝতে পারি না। আমের খোসাটি আছে বলে আমটি বাড়ে এবং পাকে। আমটি পেকে গেলে পর খোসাটি ফেলে দিতে হয়।"

মায়ারূপ ছালটি নিয়েই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাবো। বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া সবই আমের খোসার মত। একদিন এসব খসে যাবে।

মা তাঁর মহামায়ায় জীবজগৎকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। মানুষের মধ্যে বদ্ধ জীবই বেশি। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "জীবের মধ্যে চার থাক—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য। এই সংসার হলো জাল আর জীব হলো মাছ। ঈশ্বর হলেন জেলে। জেলে জানে যে, জালে যখন মাছ পড়ে তখন কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে—এরা হলো মুমুক্ষু। যে কয়টা পালিয়ে যায়—তারা হলো মুক্ত। কিছু মাছ খুব সাবধানী—তারা জালেই পড়ে না। তারা হলো নিত্যজীব। যেমন নারদ। এঁরা সংসার জালে জড়ান না। কিন্তু বেশির ভাগই জালে পড়ে। তারা জালশুদ্ধ দৌড় দেয় আর পাঁকে গিয়ে নিজেদের শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। এদের এই বোধ নেই যে, জালে পড়লে আর সহজে পালানো যায় না। এরাই হলো বদ্ধ জীব।"

মানুষ এত দুঃখ পায়, তবুও মানুষের মন পড়ে থাকে কামিনীকাঞ্চনে। রামকৃষ্ণদেব আবার এক বিস্ময়কর উপমা দিয়ে বললেন : "কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে। তবুও উট আবার কাঁটা ঘাস খায়।"

আমরা সংসারের মায়ায় আবদ্ধ রয়েছি বলে আমাদের মুখ দিয়েও যেন অনবরত রক্ত ঝরছে। তা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা কোথায়? আবার পরমপুরুষের অপূর্ব উপমা, "সংসার যেন বিশালাক্ষীর 'দ'। নৌকো একবার দহে পড়লে আর রক্ষে নেই। সেঁকুল কাঁটার মত একবার ছাড়ে তো আরেকবার এসে জড়ায়।"

আমরা এই সংসারে যেন গোলকধাঁধার মধ্যে আছি। এই গোলকধাঁধা থেকে যেন কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছি না। এক একবার ইচ্ছা হয় ঈশ্বরের নামকীর্তন করি আর অমনিতেই সংসারের নানা পাকে জড়িয়ে পড়ি। একটি বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বললেন, "সংসারে দাসীর মত থাকবে। দাসী সব কাজ করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের সে মানুষ করে, বলে—আমার হরি, আমার রাম। কিন্তু সে ভাল ভাবেই জানে যে, মনিবের ছেলেরা তার কেউ নয়।"

আমরাও সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকবো। সব কাজ করবো, সব দায়িত্ব পালন করবো, কিন্তু মন থাকবে সব সময়ে ঈশ্বরে নিবদ্ধ। সংসারে আছি বলে সংসারের সব কিছুই তো আর খারাপ নয়। সংসারের 'সং'টা বাদ দিয়ে সারটুকু গ্রহণ করতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "গোলমালের মধ্যেও বস্তু আছে। 'গোলমালের' গোলটি ছেড়ে 'মালটি' নেবে।"

সংসারে থেকেই আমাদের সাধনভজন করতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "সংসারে থেকে সাধন-ভজন করা যেন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা।" সাথে সাথে তিনি আবার একটি অভিনব দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, "যখন সাধকেরা শব সাধনা করে, তখন শবটা মাঝে মাঝে 'হাঁ' করে ভয় দেখায়। সেজন্য চালভাজা, ছোলাভাজা রাখতে হয়। হাঁ, করলে শবটার মুখে দিতে হয়। এভাবে শবটাকে ঠাণ্ডা করে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করা যায়। এইভাবে পরিবারের লোকজনদেরও ঠাণ্ডা রাখতে হয়, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিতে হয়, তবে সাধনভজনের সুবিধা হয়।"

সংসারে থেকে, সংসারের সব কাজ করে ঈশ্বরে মন রাখা সম্ভব। এই সম্পর্কে বিচিত্র উপমা গাঁথলেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি বললেন, "ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি নিয়ে চিড়া কোটে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয় আরেকজন নেড়ে-চেড়ে দেয়। সে হুশ রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আরেক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে নেয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে, তোমার কাছে এতটাকা পাওনা আছে, দিয়ে দাও।"

তেমনি করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি মন রেখে আমাদের সংসারের সব কাজ করে যেতে হবে।

পরমপুরুষের আবার উপমা। অপূর্ব চিত্রকল্পের উপর আবার চিত্রকল্প। ভাবরসসৃষ্টির জন্য তিনি প্রতীক দিয়ে সমস্ত সংশয় দূরীভূত করে দিলেন। পরমহংসদেব বললেন, "সংসারে থাকবে পানকৌটির মত। পানকৌটি সর্বদা জলে ডুব মারে। কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই গায়ে আর জল থাকে না।" কি সুন্দর রসাশ্রিত করে রামকৃষ্ণদেব আবার বললেন, "জলে দুধে এক সঙ্গে রয়েছে—চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মত দুধটি নিয়ে জলটি ত্যাগ কর।"

এই সংসার আমাদের কর্মভূমি। এই সংসারে থেকেও আমরা বিষয়রস বর্জন করে চিদানন্দরস আহরণ করার চেষ্টা করবো। সংসারে থেকেও আমরা সারটুকু গ্রহণ করবো। আরেকটি অভিনব উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, "পিঁপড়ের মত সংসারে থাকবে। বালিতে আর চিনিতে মিশে রয়েছে সংসারে, নিত্য আর অনিত্যে। বালিটুকু ছেড়ে শুধু চিনিটুকু নাও।" সংসারে থেকে আমরা কি করে ঈশ্বরের প্রতি মন রাখবো সে সম্পর্কে আবার এক উপমা দিলেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি বললেন, "মন রাখবে সব সময়ে ঈশ্বরের দিকে। যেমন দাঁত ব্যথার মত। দাঁতের ব্যথা হলে আমরা সংসারের কাজকর্ম করি, কিন্তু মন পড়ে থাকে ব্যথার দিকে।"

তেমনি আমরাও সংসারের সব কর্তব্য কাজ করে যাবো, কিন্তু মন রাখবো সেই ব্যথার দিকে। ঈশ্বরের দিকে। ব্যথা যেমন আমাকে মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে দেয় না, তেমনি আমার মনটিও নিয়ত জাগ্রত রাখবো ঈশ্বরের প্রতি।

আমরা ঈশ্বরের রসসমুদ্রে ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করার চেষ্টা করবো। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "পুকুরের যে জায়গায় মাটিটা পড়েছে তা আন্দাজ করে নিয়ে ডুব দিতে হয়। ডুব দিলে ঠিক সাধন হয়। বিচারে ফল পাওয়া যায় না। সব ব্যাপারটাই যাবার পথের কথা বলছে—কিন্তু ডুব দেয় না।"

আমি সেই সচ্চিদানন্দরূপ অমৃত সাগরে ডুব দেবো। ঠাকুরের অমৃতময় সংগীতের সাথে আমিও সুর মিলিয়ে গাইবো :

"ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙায় ডিঙে চালায় আবার
সে কোনজন।
কবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥"

॥ পনেরো ॥

সংসারে মায়ার বন্ধনে আমরা আবদ্ধ রয়েছি বলে আমরা মনে করছি, সংসারে আমার প্রয়োজন খুব বেশি। আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের কে দেখবে? এই ভেবে ভেবে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। কিন্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দেখবেন—এই কথাটা আমরা একবারও ভেবে দেখি না। এই সম্পর্কে অপরূপ একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

"এক গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা। তুই সংসার ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে আয়।

"শিষ্য বললো, ঠাকুর, এরা আমাকে এত ভালবাসে—আমার বাবা, মা, স্ত্রী—ওদের ছেড়ে আমি কি করে যাবো?

"গুরু বললেন, তুই আমার, আমার করছিস বটে, কিন্তু এসব তোর ভুল

ধারণা। তোকে একটা ওষুধ দিচ্ছি—এটা খেলেই তুই বুঝতে পারবি, তোর পরিবারের লোকেরা সত্যি সত্যি তোকে ভালবাসে কিনা। একটা ঔষধের বড়ি শিষ্যের হাতে দিয়ে গুরু আবার বললেন, এটি খাবি। তাহলেই তুই মড়ার মত পড়ে থাকবি। তবে তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। কিন্তু তোর আত্মীয়স্বজন ভাববে যে, তুই মরে গেছিস। আমি তোদের বাড়িতে উপস্থিত হলে পর তুই পূর্বাবস্থা ফিরে পাবি।

"শিষ্যটি ঠিক সেইরূপ করলো। বাড়ির সবাই মনে করলো যে, লোকটি মরে গেছে। তাই বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী সবাই অঝোরে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় সেই গুরুটি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে গো!"

"বাড়ির সবাই বললো যে, যুবকটি মারা গেছে।

"গুরু তখন মৃত যুবকটির হাত পরীক্ষা করে বললেন, না, সে এখনও মরেনি। আমি একটি ঔষধ দেবো, সেটি খেলেই যুবকটি সেরে উঠবে।

"বাড়ির সবাই যেন হাতে স্বর্গ পেলো।

"তখন গুরু বললেন, তবে আমার একটি কথা আছে। ঔষধটি প্রথমে অন্য একজনের খেতে হবে—তারপর ও খাবে। প্রথমে যে ঔষধটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। এর তো অনেক আপনার জন আছেন দেখছি। কেউ না কেউ অবশ্যই খেতে পারেন। মা, স্ত্রী এরা খুব কাঁদছেন। এদের মধ্যে কেউ খেতে পারেন।

"সবাই কান্নাকাটি থামিয়ে চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। এরপর মা বললেন, এত বড় সংসার—আমি চলে গেলে এই সব দেখবে কে? তিনি ভাবতে লাগলেন।

"স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে এই বলে কাঁদছিলো, দিদিগো! আমার কি উপায় হবে গো! সে বললো, ওঁর যা হবার তাতো হয়েই গেছে। আমার দু'তিনটি নাবালক ছেলে-মেয়ে। আমি যদি চলে যাই, তবে ওদের দেখবে কে?

"শিষ্যটি তখন শুয়ে শুয়ে সব দেখছিল আর শুনছিল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, গুরুদেব, চলুন। আপনার সঙ্গে যাই।"

আমরাও একটা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। সেই বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে পারলে বুঝবো যে, সংসারে কেউ কারো নয়। কা তব কান্তা। যিনি সৃষ্টি করছেন, তিনিই সবাইকে প্রতিপালন করছেন। কেউ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করছি, আর কেউ বা আঁস্তাকুড়ের পাশে আছি—এ সবই তাঁরই ইচ্ছা।

তীব্র বৈরাগ্য হলে আত্মীয়স্বজনের বন্ধন আর থাকে না। জগৎসংসার সব কিছুই মেকী বলে প্রতীয়মান হয়। এ সম্পর্কে পরমপুরুষ আরেকটি গুরুশিষ্যের গল্প শোনালেন।

"একজন শিষ্য তার গুরুকে বলেছিলো, আমার স্ত্রী আমাকে খুবই আদরযত্ন করে। সেজন্য সংসার ছেড়ে যেতে পারছি না।

"শিষ্যটি হঠযোগ অভ্যাস করতো। শিষ্যটির স্ত্রীর আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য গুরু তাকে একটা ফন্দী শিখিয়ে দিলেন।

"একদিন বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়ে গেল। পাড়ার লোকেরা এসে দেখলো, হঠযোগী এঁকেবেঁকে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। সবাই বুঝল যে তার মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রী চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, ওগো! আমাদের কি উপায় হবে গো! তুমি আমাদের কি করে গেলে গো।

"এদিকে আত্মীয়স্বজনেরা খাট এনেছে। মৃতদেহ ঘর থেকে বার করবে।

"কিন্তু একটা ঝামেলা দেখা গেল। লোকটা এঁকেবেঁকে থাকার জন্য দরজা দিয়ে বার করা যাচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে গিয়ে একটা কাটারি নিয়ে এলো। সেটি দিয়ে সে দরজার চৌকাঠ কাটতে লাগলো।"

"স্ত্রী চীৎকার করে কাঁদছিলো। সে দুমদাম আওয়াজ শুনে দৌড়ে এলো। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলো, ওগো! কি হয়েছে গো!

"ওরা বললো, ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি।

"তখন স্ত্রী বললো, দোহাই তোমাদের, অমন কাজটি করো না। আমি এখন বিধবা হয়েছি। আমার আর দেখবার লোক কেউ নেই। কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দরজা গেলে আর হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তাতো হয়েই গেছে—এবার ওঁর হাত-পা কেটে বের কর।

"তখন হঠযোগী এক লাফে উঠে পড়লো। তার শরীর থেকে ঔষধের ঝাঁঝ চলে গেছে। সে স্ত্রীকে বললো, তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটার কথা বলছিস—এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।"

—চাই তীব্র বৈরাগ্য। সংসারে থেকেও জগৎসংসারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। সব সময় ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "যতক্ষণ না হিসাব মেলে দোকানদার ততক্ষণ ঘুমায় না। হিসাব ঠিক হলে তবে শান্তি।" আমাদের জীবনের হিসাবের খাতা আমরা মিলালাম কোথায়? জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই যখন ঈশ্বর দর্শন লাভ, আমরা অহর্নিশ সেই চেষ্টাই করে যাবো।"

এই সংসারে কামিনীকাঞ্চনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে জীবের ব্যক্তি স্বাধীনতা পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। উচ্চ আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তিরাও একবার প্রলুব্ধ হলে নীচের দিকে নামতে থাকেন। এ সম্পর্কে আমরা কতটা সতর্ক? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পরিহাস রসাশ্রিত এক অনবদ্য কাহিনী বললেন :

"জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দিরের পূজারীরা প্রথমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তখন তাদের খুব তেজ ছিল। রাজা ডেকে পাঠালেও, তারা যেতো না। বলতো, রাজাকে এখানে আসতে বল।

"রাজা তখন অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা পূজারীদের ধরে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য আর লোক পাঠাতে হয় না। পুরোহিতরা নিজেরাই গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বলে, মহারাজকে আশীর্বাদ করতে এসেছি, মহারাজের জন্য নির্মাল্য এনেছি।

পুরোহিতদের ঘর তুলতে হবে, টাকার দরকার। রাজার কাছে গিয়ে হাত পাততে লাগলো। আজ ছেলের অন্নপ্রাশন। কাল হাতে-খড়ি এসব কত আবদার নিয়ে উপস্থিত হতে লাগলো। বিয়ের পর পুরোহিতদের আর সে তেজ নেই, তপস্যার আর কোন শক্তি নেই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকতে স্বাধীনতা পর্যন্ত লোপ পেলো। তাই এখন দাসত্বের যন্ত্রণা।"

সাধনমার্গে এগিয়ে গেলেও যদি আমরা সংযমী হতে না পারি, যে কোনরকম প্রলোভনে যদি আমরা জড়িয়ে পড়ি, তবে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব রসাশ্রিত গল্প বললেন বারশো নেড়া তেরশো নেড়ীর।

"নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো নেড়া শিষ্য ছিল। কিছুদিন ধ্যানধারণার পর এরা সব সিদ্ধ হয়ে গেল। বীরভদ্র চিন্তা করে দেখলেন যে, এরা সিদ্ধপুরুষ হয়েছে—এখন লোকজনকে যা বলবে তাই ফলবে। এখন কেউ যদি না জেনে কোন অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

"বীরভদ্র এসব ভেবে একদিন ওদের ডেকে বললেন, তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে এসো। নেড়ারা সব সন্ধ্যা আহ্নিক করতে গেল। তাদের অপরিসীম তেজ। ধ্যান করতে করতেই ওদের সমাধি হয়ে গেল। মাথার উপর দিয়ে জোয়ার চলে গেল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। আবার ভাঁটা এসে পড়লো—তবু তাদের হুঁশ নেই। তেরশো শিষ্যের মধ্যে একশো জন গুরুর মনের কথা বুঝতে পেরে সরে পড়লো। বা কি বারশো ফিরে এলো গুরুর কাছে।

"তখন বীরভদ্র তেরশো নেড়ী দেখিয়ে বললেন, 'এরা তোমাদের সেবা করবে,

তোমরা এদের বিয়ে কর। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে এরা নেড়ীদের সঙ্গে বাস করতে লাগলো। দেখতে দেখতে তাদের তেজ কমে গেল, তপস্যার আর তেমন জোর নেই। কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে থাকার ফলে তারা তাদের শক্তি হারিয়ে ফেললো।"

আমরা মাঝে মধ্যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছি বটে, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি রয়েছে বলে, তীব্র বৈরাগ্য নেই বলে আমাদের কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হয়ে উঠছে না। রামকৃষ্ণদেব বললেন, "চাষের জন্য তুমি বহু চেষ্টা করে জমিতে আল বেঁধেছো, কিন্তু আলের গর্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আল বাঁধা পণ্ডশ্রম হলো।"

চাই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হলে শুধু ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে কি হবে? চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে চাই ব্যাকুলতা। ব্যাকুল হয়ে অহর্নিশ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে কিংবা সতীর্থদের সঙ্গে আমাদের খুব অন্তরঙ্গতা। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি একবার মনে উঁকি দিলেই আর আমাদের সহমর্মিতা থাকে না। পরম-পুরুষ রসাশ্রিত উপমা দিয়ে বললেন, "দুটো কুকুরের মধ্যে দেখবে হয়তো খুব ভাব। দুজনে দুজনের গা চাটাচাটি করে। কিন্তু যেই গৃহস্থ দুটো ভাত ফেলে দিল সামনে, অমনি কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গেল।"

ক্ষুদ্রতম স্বার্থবুদ্ধি আমাদের উপরের দিকে উঠতে দেয় না। মনকে যখন একবার ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করেছি, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিগুলোকেও ত্যাগ করি না কেন? সত্যি সত্যি ঈশ্বরের প্রেম হলে নিজের দেহের প্রতিও কোন মমতা থাকে না আর স্বার্থবুদ্ধি তো অন্য কথা। রামকৃষ্ণদেব দেবদুর্লভ কণ্ঠে গেয়েছেন :

"দোষ কারু নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা,
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী. বিগুণ করেছে স্বগুণে।
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দেথা মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে কর পার॥"

অহংকারই আমাদের পতনের কারণ। আমরা বিদ্যার অহংকার করি, অর্থের অহংকার করি, বাড়ি গাড়ির অহংকার করি, সংস্কৃতির অহংকার করি, এমনকি

ধর্মেরও অহংকার করি। এই অহংকার বোধ আমাদের মধ্যে রয়েছে বলে তো আমরা এগিয়ে যেতে পারি না। অথচ আমরা ভাবি, আমরা তো অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "উঁচু টিবিতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। খাল জমিতে জমে। তেমনি তাঁর কৃপাবারি যেখানে অহংকার সেখানে দাঁড়ায় না।"

যতক্ষণ অহংকার আছে, ততক্ষণ ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা দেখতে পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণদেব আবার বললেন, "ভগবানের ঘরের সামনে রয়েছে অহংকার স্বরূপ গাছের গুঁড়ি। সে গুঁড়ি না ডিঙালে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।"

তাই আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে অহংকার রূপ গাছের গুঁড়ি অতিক্রম করতে হবে। এর জন্য চাই নিয়ত প্রচেষ্টা। চুলকে যেমন সহজে সোজা রাখা যায় না, সোজা করতে গেলেই আবার বাঁকা হয়ে যায়, অহংকারও ঠিক তেমনি। অহংকার দূর করার চেষ্টা করছি, আবার কোত্থেকে নূতন নূতন সব অহংকার আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে বসে আছে সে হিসাব করছি কোথায় ? পরমহংসদেব এ সম্পর্কে অপূর্ব একটি রসস্নিগ্ধ গল্প বললেন :

"একবার একজন লোক তার গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধিলাভ করেই সে ভূতকে ডেকে পাঠালো। যেমনি ডাকা, অমনি ভূত সশরীরে এসে হাজির হলো। ভূতটি সামনে এসেই বললো, হুকুম দিন কি কাজ করতে হবে। তবে মনে রাখবেন যেদিন কোন কাজই দিতে পারবেন না. সেদিন কিন্তু আপনার ঘাড় মটকাবো।

"লোকটি ভূতটিকে একটির পর একটি কাজ দিতে লাগলো আর ভূতটিও চোখের নিমেষে সেই কাজটি করে দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত লোকটি আর কোন কাজই খুঁজে পায় না। কি সর্বনাশ! এবার যে ভূত তার ঘাড়ই মটকাবে!

"ভূত আর কাজ নেই বুঝতে পেরে বললো, এবার তাহলে তোমার ঘাড় ভাঙি?

তখন ভূতসিদ্ধ বললো, নাহে, এখনও আমার কাজ বাকি আছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর।' এইকথা বলে সে সোজা তার গুরুদেবের কাছ চলে এল। গুরুদেবকে সে সব কথা খুলে বললো।

"সব শুনে গুরুদেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এই কয়গাছা চুল নিয়ে যাও আর ভূতকে বলগে এই চুলগুলো সোজা করতে।

"শিষ্য চুলের গাছা নিয়ে ভূতের কাছ ফিরে এলো আর ভূতকে চুল সোজা করতে বললো।

"ভূত ভাবলো, এ আর তেমন কি শক্ত কাজ। চুল সোজা করেই সে আবার নূতন কাজ চাইবে। কিন্তু চুল কি আর সহজে সোজা হয়? যেমন বাঁকা তেমনি বাঁকাই থেকে যায়।"

মানুষের অহংকারও ঠিক এই চুলের মত। সোজা থেকে বাঁকা হয়ে যায়। অহংকার না গেলে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না।

॥ ষোলো ॥

সাধনভজনে মনকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি কোথায়? সাধনভজনে যে সামান্য বাধা-বিঘ্নগুলো আছে, সেগুলোই যেন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। সংসারের সমস্যাগুলো যেন একের পর এক আমাদের একেবারে পেয়ে বসেছে। ফলে আমাদের ইষ্ট চিন্তা ব্যাহত হচ্ছে। সংসারের সমস্যাগুলো দূর করতে গিয়ে আমরা সংসারের মায়াজালেই নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলছি। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব এক অপূর্ব গল্প বললেন:

'সামান্য কুটির বেঁধে সাধনভজন করে এক সাধু। তার সম্বলের মধ্যে সামান্য দু'একটি কৌপীন। সংসার থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। তাই খুব অহংকার—এবার সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরলাভ করতে পারবে।

'কিন্তু মুশকিল হলো দিনের বেলা ভিক্ষায় বেরোলে কিংবা রাতে ঘুমিয়ে পড়লে পর ইঁদুর এসে তার কৌপীন কেটে দিয়ে যায়। সাধু তখন বাড়ি বাড়ি কাপড়ের টুকরো ভিক্ষা করতে লাগলো। কাঁহাতক লোকে আর কাপড় দেবে; কেউ কেউ বললো, ইঁদুর তাড়াবার জন্য বেড়াল পুষুন।

'মন্দ কি! সাধু তখন বেড়াল পুষতে লাগলো। কিন্তু বেড়ালকেই বা খাওয়াবে কি? বেড়ালের জন্য দুধ চাইতো লাগলো গৃহস্থদের কাছে। কিন্তু কাঁহাতক লোকে আর দুধ দেবে? তাই সবাই পরামর্শ দিল, গরু পুষুন।

'সেই ভাল। বেড়ালকে দুধ খাওয়ানো হবে আবার নিজেও খাওয়া যাবে। গরু কিনে আনলো সাধু। কিন্তু গরুর জন্য আবার খড় চাই। সাধু গৃহস্থদের কাছে খড় চাইতে লাগলো। কে কত আর খড় দেবে তাকে? খড়ের বদলে উপদেশ দিল, আশ্রমের কাছে যে পোড়ো জমি আছে তাতে চাষ করুন।'

'বহুৎ আচ্ছা। সাধু চাষ-আবাদে মন দিল। বেশ ভালই ফসল হলো। এখন তুলে রাখে কোথায়? মস্ত এক গোলাবাড়ি তৈরি করলো।

'হঠাৎ একদিন গুরু এসে হাজির হলেন। চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি তো তাজ্জব বনে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন সাধুকে, এসব কি ব্যাপার !'

'সাধু অপ্রতিভ হয়ে বললো, প্রভুজী, সবই কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এক সামান্য কৌপীনের জন্য সাধুকে কিভাবে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হতে হলো! এটাই হচ্ছে জীবনের ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি থেকে মুক্তির জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাতে হবে।

মানুষ সুখের আশায় সংসার চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘুরপাক খেতে খেতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর বুঝতে পারে, সংসারে সত্যিকারের কোন শান্তি নেই। ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল—ঈশ্বরের উপরই আমাদের একমাত্র নির্ভরশীলতা। তিনিই অবলম্বন। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব পাখি আর জাহাজের মাস্তুলের গল্প বললেন। প্রতীক দিয়ে তিনি মনের সংশয়কে দূর করার চেষ্টা করলেন। গল্পটি এই রকম :

'একটি জাহাজ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো। জাহাজটির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো একটা পাখি। উড়তে উড়তে পাখিটা ক্লান্ত হয়ে খানিকক্ষণ জাহাজের মাস্তুলের উপর এসে বসলো।

'তারপর পাখিটা ডাঙায় ফিরে যেতে চাইলো। প্রথমে উড়ে সে উত্তর দিকে যেতে লাগলো। কিন্তু কোথায় তীর ? চারদিকে শুধু জল আর জল। পাখিটা আবার ফিরে এলো জাহাজে।

'খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পাখিটা এবার রওনা হলো দক্ষিণ দিকে। এবারও কোন কূল-কিনারা না পেয়ে পাখিটা ফিরে এলো জাহাজে।

এভাবে সে উড়ে চললো পূব দিকে। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হলো না। আবার ওকে ফিরে আসতে হলো জাহাজে।

পুনরায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পাখিটা উড়ে চললো পশ্চিম দিকে। অনেকক্ষণ উড়েও ডাঙার সন্ধান না পেয়ে পাখিটা ফিরে এসে বসলো জাহাজের মাস্তুলে। চারদিক ঘুরে তীর না পেয়ে এবার সে বুঝতে পারলো যে, জাহাজের মাস্তুলটিই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তখন সে নিশ্চিন্তে জাহাজের মাস্তুলেই দিন কাটাতে লাগলো।'

আমরাও সংসার সমুদ্রে একবার এদিকে এবং আরেকবার ওদিকে সাঁতার কাটতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না। ঈশ্বরই আমাদের

একমাত্র ভরসা। শেষ আশ্রয়স্থল। তাঁর উপর নির্ভর করেই আমরা সংসার সমুদ্র অতিক্রম করার চেষ্টা করবো।

ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে এগিয়ে গেলে আমরা অনেক বাধা বিপত্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। সে সম্পর্কে অনবদ্য একটি চিত্র আঁকলেন রামকৃষ্ণদেব।

'সরু আলপথ দিয়ে বাপ দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে চলেছেন। বড় ছেলেটি সেয়ানা—তাই সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। আর ছোট ছেলেটিকে বাবা আরেক হাত দিয়ে কোলে করে নিয়ে চলেছেন। ছোট ছেলেটি দাদার মত সেয়ানা নয়—স্বাধীনও নয়। সে আছে বাবার নির্ভয়ের দুর্গে। ঠিক সেই সময়ে মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক শঙ্খচিল উড়ে গেল।

'পাখি দেখে দুই ভাই-ই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। দুই ভাই-ই বাবার হাত ছেড়ে দিল। বড় ভাই বাবার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার ফলে পড়ে গেল। ছোট ভাই পড়লো না। সে নিঃশঙ্ক। তাকে বাপ ধরে রেখেছে। সে স্বচ্ছন্দে হাততালি দিল।'

আমরা সর্বতোভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে পারলে আমরাও নিঃশঙ্কচিত্তে হাততালি দিয়ে বেড়াতে পারতাম। কিন্তু আমরা নিজেদের সেয়ানা, স্বাধীন ভাবি বলেই হাততালি দিতে গিয়ে পড়ে গিয়ে কাঁদি। সেজন্য চাই ঈশ্বরের উপর ঐকান্তিক নির্ভরশীলতা। আবার রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব উদাহরণ দিলেন। তিনি বললেন, 'বাঁদরের বাচ্চা জোর করে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। মা রাগ করে ফেলে দেয়। বাচ্চাগুলো পড়ে গিয়ে কিচির-মিচির শব্দ করে। কিন্তু বিড়ালছানা 'ম্যাও, ম্যাও' করে অর্থাৎ কিনা 'মা-মা' বলে ডাকে। মা যেখানেই রাখে সেখানেই সুখে থাকে—তা ছাইয়ের গাদাতেই হোক কিংবা গদি বিছানাতেই হোক।'

একেই বলে মায়ের উপর নির্ভরশীলতা। মা আমাদের যেখানেই রাখুন—তা ছাইয়ের গাদাতেই হোক কিংবা গদি বিছানাতেই হোক—তার মধ্যেই আমরা অমৃতরস পিপাসী হবো। সেই নির্ভরশীলতা থাকা চাই। আবার পরমপুরুষের উপমা। মালার ন্যায় একটার পর একটা উপমা গেঁথেছেন তিনি। অপূর্ব এক রসাশ্রিত ভঙ্গীতে তিনি বললেন, 'শাশুড়ী বললো, আহা বৌমা, সবারই সেবা করবার লোক আছে, কেবল তোমার কেউ নেই। কেউ যদি তোমার পা টিপে দিতো তাহলে বেশ হতো। বৌ বললো, 'ওগো, আমার পা হরি টিপবেন।'

আমি যদি ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হই, তিনিই আমার সব

ভার বহনের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি স্বার্থপর লোভান্ধ বলে বঞ্চিত হই, আঘাত পাই। আঘাতে আঘাতেই আমি পরিমার্জিত হবো। দুঃখের ভিতর দিয়েই আমি তাঁকে আলিঙ্গন করবো। বলবো :

"দুঃখের বেশে এসেছো বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।"

এই সুন্দর ভুবনে ঈশ্বর আমাদের জন্য সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাঁর কৃপাতেই আমরা বেঁচে আছি। বিশ্ব-ভুবনের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যেই যেন তাঁর নূপুর নিক্বণ শুনতে পাচ্ছি। রামকৃষ্ণদেব ফের একটি রসস্নিগ্ধ গল্প বললেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতার গল্প। গল্পটি হলো :

'একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয়-আশয় সে কিছুই জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে তাকে ভিক্ষা দিতে গেল।

'যুবতী মেয়ের দিকে সে কোনদিন তাকায়নি। হঠাৎ এই যুবতী মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে সন্ন্যাসী মেয়েটির মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা-এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে?'

'মেয়েটির মা বললো, না বাবা, ভবিষ্যতে ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর ওর বুকে স্তন দিয়েছেন। ঐ স্তনের দুধ খেয়ে ছেলে বড় হবে।

'সন্ন্যাসী তখন বললো, তবে আর কি ভাবনা! আমি কেন তবে আর ভিক্ষা করি? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে খেতে দেবেন।

'ঈশ্বরের কাছেই আমার কাতর প্রার্থনা জানাবো চোখের জলে। নিজের চোখের জলেই তৃষ্ণা নিবারণ করবো।

বেদে আছে, 'পিতা নোহসি। পিতা নো বোধি।' হে ঈশ্বর। তুমি আমাদের পিতা। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধের আলোতে আমাদের দুচোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ'—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন।

দিনের বেলা আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় না। তাই বলে কি আমরা বলবো যে, নক্ষত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। আকাশে নক্ষত্র দেখতে হলে আমাদের দিনান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি? ত্যাগ এবং তিতিক্ষার ভিতর দিয়েই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। একটি অভিনব উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'দুধে যে মাখন আছে তা কি দুধ দেখে বোঝা যায়? যদি মাখন

দেখতে চাও, তবে নির্জনে দই পাতো। তারপর সূর্যোদয়ের আগে সেই দই মন্থন করো। তবেই মাখন দেখতে পাবে।'

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এমনিতে বুঝতে না পারলেও, তাঁকে আকুল হয়ে ডাকলে, নির্জনে বসে কাঁদলে তবেই তো তিনি সাড়া দেবেন। রামকৃষ্ণদেব আবার অপূর্ব ব্যঞ্জনায় এক গভীর ইঙ্গিত করলেন। তিনি বললেন, কোন বড় পুকুরে মাছ ধরতে হলে কি করবে? যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের কাছ থেকে খোঁজ নেবে। জানবে কি কি মাছ আছে। কি চার দিতে হয়, ঐ পুকুরের মাছ কি টোপ গেলে ইত্যাদি। খোঁজখবর নিয়ে তুমি সেরকম ব্যবস্থা করলে। তারপর ছিপ নিয়ে বসলে। ছিপ নিয়ে বসামাত্রই মাছ ধরা পড়ে না। স্থির হয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে 'ঘাই' আর 'ফুট' দেখতে পাওয়া যায়। মনে তখন একটা আনন্দময় বিশ্বাস আসে যে, সত্যি সত্যি পুকুরে মাছ আছে এবং তুমি তা ধরতে পারবে।'

এই সৃষ্টি হচ্ছে পুকুর আর মাছ হচ্ছে ঈশ্বর। যাঁদের কাছ থেকে খোঁজখবর করতে হবে তাঁরা হলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। চার হচ্ছে ভক্তি, মন ছিপ, প্রাণ হচ্ছে কাঁটা আর নাম হচ্ছে তাঁর টোপ। 'ঘাই' আর 'ফুট' হচ্ছে ঈশ্বরের ভাবরূপ। অচলাভক্তি নিয়ে সর্বদা তাঁর নামকীর্তন করে যাবো। তবেই তো একদিন না একদিন তাঁর ভাবরূপ দেখতে পাবো। তখন আমাদের অন্তরে আসবে আত্মবিশ্বাস।

॥ সতেরো ॥

অনেক সাধ্য সাধনার পর মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে চেয়েছি। তবুও মনকে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ করতে পারছি কই? মাঝে মাঝে ঈশ্বরচিন্তা করছি, এর মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে সংসারের চিন্তা এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। রামকৃষ্ণদেব চমৎকার একটি উপমা দিয়ে বললেন, 'মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি। পুঁটলি যদি একবার খুলে গিয়ে সরষে ছড়িয়ে পড়ে তবে সেগুলো কুড়িয়ে এনে আবার পুঁটলি বাঁধা কি সহজ কথা? কোনোরকমে মনটাকে একটু হয়তো গুটিয়ে এনেছি। অমনি কোত্থেকে বিষয়চিন্তা এসে দিল সব ছত্রখান করে।"

পুঁটলি বাঁধতে হবে খুব দৃঢ় করে। মন যাতে সব সময় বিষয়চিন্তায় নিবদ্ধ না থাকে। সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরমপুরুষ আবার এক অনুপম

ভঙ্গীতে বললেন, 'তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা-না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যাবে। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ তেল মেখে তবে সংসারের কাজ করতে হয়।'

সংসারেই আছি যখন তখন সংসার ছেড়ে পালাবার জো কোথায়? তাই এই সংসারে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরূপ তেল মেখে আমার কর্তব্য কাজ করে যাবো। তাঁকেই আমাদের আমমোক্তারনামা দিয়ে এই সংসারেই থাকবো—যা হয় ইনিই করুন। আমি শুধু বিড়ালছানার মত তাঁকে ডাকবো আকুল হয়ে। মা আমাকে যেখানে খুশি যেমনভাবেই রাখুন—আমি তাতেই তৃপ্ত। সময় না হলে কোন কিছুই হয় না। আমাদের যদি ভোগকর্ম বাকি থেকে থাকে, তবে তো আমাদের সেজন্য অপেক্ষা করতে হবেই। রামকৃষ্ণদেব এ সম্পর্কে বলিষ্ঠ একটি উপমা চয়ন করে বলেন, ফোড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে।'

ফোড়া পেকে মুখ হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর নামকীর্তন করেই আমাদের মনের ফোড়া পাকাবো। তাঁর নাম-কীর্তন করতে হবে আর ধৈর্য ধরে তাঁর কৃপালাভ করার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। রামকৃষ্ণদেব আবার একটি রসাশ্রিত অভিনব উপমা দিয়ে বললেন, 'ছেলে বলেছিলো, মা আমি এখন ঘুমুই। আমার হাগা পেলে তখন তুমি আমাকে তুলে দিও।

'মা বললেন, বাবা, বাহ্যের বেগই তোমাকে তুলে দেবে, আমার তুলতে হবে না।'

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক আবেগের ভিতর দিয়েই আমরা রচনা করবো বেগ। সেই বেগই আমাদের মধ্যে চৈতন্য শক্তির সৃষ্টি করবে।

আমরা দু'দিনের জন্য সংসার করতে এসেছি। এ সংসার হচ্ছে আমাদের কর্মভূমি। মহৎ কাজ করার জন্যেই তো আমাদের জগৎ-সংসারে আসা। সেই কাজগুলোও দ্রুত শেষ করে আমরা ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেদের সমর্পণ করবো। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'স্বর্ণকার সোনা গলাবার সময় পাখা, চোঙা সব দিয়ে হাওয়া করতে থাকে যাতে বেশি আগুন পেয়ে তাড়াতাড়ি সোনা গলে যায়। সোনা গলে যাবার পর স্বর্ণকার বলে, তামাক সাজ। খুব জেদী হতে হয়, তবেই সাধন-ভজন হয়। প্রথম প্রথম একটু খাটতে হয়, তারপর বসে বসে পেনসন পাওয়া।'

অনুরাগ অঞ্জন চোখে মেখে তবে সংসার করতে হয়। চাই রাগভক্তি। চাই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। পরমপুরুষ কি মনোরম করে বুঝিয়ে দিলেন

'দেখ, বাঘ কেমন কপ্ কপ্ করে অন্য পশুদের খেয়ে ফেলে। তেমনি অনুরাগ বাঘ কামক্রোধ এইসব পশুদের খেয়ে নেয়। গোপীদের সেইভাব হয়েছিল কৃষ্ণ অনুরাগ।'

সংসারে থেকে সাধন-ভজন করা খুবই কঠিন ব্যাপার—এ বিষয়ে কো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলে তা অনেক সহজ হয়ে যায়। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যেমন ধরো বনবন কে ঘুরলে মাথা ঘুরে একটা লোক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু খুঁটি ধরে ঘুরলে আর ভয় থাকে না। কাজ করে যাও। খুটি ধরে থাকো।'

খুঁটি হলো ঈশ্বর। তাঁকে আমরা সব সময় আঁকড়ে ধরে সংসারের সব কাজ করে যাবো।

সাধনভজনের ভিতর দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। সেজন্য চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। রামকৃষ্ণদেব মনের মাধুর্য মিশিয়ে বললেন, 'ধরে নাও জলভরা দশটা ঘট আছে। প্রতিটি ঘটের জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। এবার নটা ঘট তুমি ভেঙে ফেলে দিলে। তখন রইলো শুধু দেদীপ্যমান সূর্য ও আর একটি ঘট। সেই ঘটের জলেই শুধু সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়বে।'

এক একটি ঘট হচ্ছে এক একটি জীব। সূর্যের প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য রেখে সত্য সূর্যের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এভাবেই জীবাত্মা পরমাত্মার দিকে এগিয়ে যায়। আমাদের চাই সত্য সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠার কাহিনী শোনালেন রামকৃষ্ণদেব।

'একজন তার গুরুকে জিজ্ঞেস করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়?

'গুরু বললেন, এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে দেখিয়ে দিই কি করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—এই বলে তিনি শিষ্যকে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলের ভেতরে চুবিয়ে ধরলেন।

'বেশ কিছুক্ষণ পর শিষ্য ছটফট করে ওঠায় তাকে ছেড়ে দিয়ে গুরু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিলো?

'লোকটি বললো, আমার প্রাণ যায় যায় মনে হচ্ছিলো।'

গল্পটি শেষ করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ আটুবাটু করে তখনই বুঝবে যে, ঈশ্বর দর্শনের আর বেশি দেরি নেই। অরুণোদয় হলে, পূর্বদিক লাল হলে তবেই জানবে যে, এখন সূর্য উঠবে।'

আমরাও প্রাণ ঢালা ভক্তি নিয়ে সেই অরুণোদয়ের জন্য অপেক্ষা করবো।

সংসারে বাস করতে গেলে তার কিছু না কিছু কালিমা আমাদের গায়ে লাগবেই। রামকৃষ্ণদেব সংসারকে বলেছেন, যেন কাজলের ঘর। যতই তুমি সেয়ানা হওনা কেন, কাজলের ঘরে থাকলে একটু না একটু দাগ লাগবেই।

কাপড়ে দাগ লাগলে আমরা সাবান দিয়ে কেচে ফেলি। আমাদের গায়ের কাজল আমরা ভক্তি সাবান মেখে চোখের জলে ধুয়ে মুছে ফেলবো। আবার রামকৃষ্ণদেবের উপমা। প্রতি কথায় আনন্দরস পরিবেশন করে মানুষের মনে তিনি ভাবরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। রামকৃষ্ণদের বললেন, 'যে বাটিতে রসুন গুলেছো, সে বাটি হাজারবার ধোও, তবু রসুনের গন্ধ যাবে না।'

এক অসতর্ক মুহূর্তে বাটিতে রসুন গুলে ফেলেছি। ভুল করে ফেলেছি। তবু বারবার চোখের জলে সেই বাটি ধুয়ে যাবো যতক্ষণ না রসুনের গন্ধ দূর হয়। অমৃত পুরুষ রামকৃষ্ণদেব উপদেশ দিলেন, 'সংসারে পাঁকাল মাছের মত থাক। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁকের চিহ্নটি পর্যন্ত থাকে না।'

আমরা সংসারের পাঁকে ডুবে রয়েছি। বিবেক বৈরাগ্য গায়ে মেখে আমরা সংসারে বাস করবো যাতে আমাদের গায়ে পাঁক না লাগে। পরমপুরুষ আবার একটি রমণীয় উপমা দিয়ে বললেন, 'সংসারে থাক ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের বেগে এঁটোপাতা কখনো ঘরের মধ্যে চলে আসে আবার কখনো উড়ে যায় আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেদিকে যায়; কখনো ভাল জায়গায় আবার কখনো মন্দ জায়গায়।'

তিনিই আমাকে সংসারের পাঁকে এনে ফেলেছেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাবো, তিনিই যেন আবার আমাকে ঝড়ের বেগে ভাল জায়গায় তুলে নিয়ে যান।

আমরা সংসারে রয়েছি বলে আমাদের মন কখনো উঁচুতে আবার কখনো নিচুতে ওঠানামা করে। আমরা কখনো ঈশ্বর চিন্তা করছি, হরিনাম করছি, আবার কখনো বা কামিনীকাঞ্চনেই মন দিয়ে বসে আছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এ সম্পর্কে অনবদ্য একটি কথার ছবি আঁকলেন। 'যেমন মাছি। কখনো সন্দেশে বসে, আবার কখনো বা পচা ঘায়ে।'

আমাদের মন যখনই পচা ঘায়ে বসতে চাইবে অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনের দিকে মন ধাবিত হবে, তখনই আমরা তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানাবো। বলবো, হে ঈশ্বর, তুমিই সন্দেশ। তুমিই অমৃতরসস্বরূপ, তুমিই আদি এবং অন্ত।

আমার মন যেন সর্বদা তোমার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। তোমাকে ছাড়া এ জীবনে আমি আর কিছুই প্রত্যাশা করি না।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র ভক্তির সঞ্চার হলে, আমাদের মনে জেগে ওঠে অহংবোধ। আমরা ভাবি, আমাদের মত ভক্ত বোধ হয় ত্রিভুবনে নেই। আমরাই খুব উদার আর অন্যদের মন খুব নোংরা। কিন্তু এটা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের দরকার আত্মবিশ্লেষণ করার। এই প্রসঙ্গে আনন্দপুরুষ রামকৃষ্ণদেব অবতারণা করলেন অন্য এক গল্পের '

'রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক সাধুর খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। সেখান দিয়ে এক ভিস্তিঅলা জল নিয়ে যাচ্ছিলো। সাধুকে তৃষ্ণার্ত দেখে সে সাধুকে জল দিতে চাইলো। তখন সাধু জিজ্ঞাসা করলো, তোমার ভিস্তিটি পরিষ্কার তো ?

'উত্তরে ভিস্তিঅলা বললো, আমার ভিস্তিটি খুব পরিষ্কার। এটাকে আমি রোজ খুব ভাল করে পরিষ্কার করি। কিন্তু তোমার ভিস্তিটি তো খুব নোংরা দেখছি। এর মধ্যে রয়েছে মলমূত্র ইত্যাদি নানারকম মালিন্য।'

নিজের মনের জঞ্জাল আগে পরিষ্কার করতে হবে। নিজেকে ধার্মিক বলে কখনো প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। পরমপুরুষ নারদের কাহিনী শুনিয়ে ভক্তদের তাই সতর্ক করেছিলেন।

''একবার নারদ ভাবলেন, তাঁর মত ভক্ত নেই ত্রিভুবনে। তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন স্বয়ং ভগবান। তিনি একদিন নারদকে ডেকে বললেন, অমুক জায়গায় অমুক লোক আছে, সে খুব ভক্ত। তার সঙ্গে একদিন আলাপ করে এসো।

'তক্ষুনি কৌতুহলী নারদ এসে হাজির হলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। পরীক্ষা করবেন তিনি সেই লোকটির ভক্তির পরাকাষ্ঠা। লোকটাকে দেখে নারদের মোটেই ভাবান্তর হলো না। সামান্য একজন চাষা মাত্র। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করে লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে যায় আর সারাদিন সেখানে চাষবাস করে। রাত হলে খেয়েদেয়ে শুতে যায়, আর শোবার আগে আরেকবার হরিনাম করে।

'এই তার ভক্তি !

'ভগবানের কাছে ফিরে গেলেন নারদ। চাষা ভক্ত সম্পর্কে ভগবানের কাছে উপহাস করলেন।

'ভগবান তখন নারদের হাতে এক বাটি তেল দিয়ে বললেন, এই তেলের

বাটিটা হাতে করে আমার বাড়ির চারদিক ঘুরে আস। কিন্তু সাবধান, এক ফোঁটাও তেল যেন পড়ে না যায়।

'তথাস্তু। তেলের বাটি খুব সাবধানে হাতে নিয়ে নারদ ঘুরে এলেন।

'ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, বাটিটা নিয়ে ঘোরার সময়ে তুমি কতবার আমার নাম করেছিলে ?

'একবারও নয়—নারদ বললেন, কি করে করব ? কানায় কানায় ভর্তি তেলের বাটির দিকে লক্ষ্য রাখবো না আপনার নামকীর্তন করবো ?

'তবেই দেখতে পাচ্ছো—বললেন শ্রীভগবান, তুমি যে নারদ—সব সময় ঈশ্বর চিন্তা কর, সামান্য এক তেলের বাটি তোমাকে ঈশ্বরের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে। আর গরীব ওই চাষাটি, সে কত বড় সংসার প্রতিপালন করছে. কত বড় তেলের বাটি সে মাথায় বহন করে চলেছে ; তবুও প্রত্যহ সে দু'বার করে আমার নাম করে !'

আমরাও সেই চাষাটির মত হবো। সংসারের কত বড় দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। তবু তাঁকে ভুলে গেলে আমাদের চলবে কেন ?

সংসারীদের ঈশ্বর সাধনা সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি সংসারী হয়েও ভগবানের পায়ে ভক্তি রেখে সংসার করে সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন ধরো, একজন মুটে মাথায় দু'মন বোঝা নিয়ে আছে, এমন সময় পথে বর যাচ্ছে। সে দু'মন বোঝা নিয়েই বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে এমন করা যায় না।'

কিন্তু আমরা তো মহাপাপী—মহাপাতক ! আমরা কি করে তাঁর নাম গুণ-কীর্তন করবো ? রামকৃষ্ণদেব বরাভয় কর তুলে আমাদের জন্য অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বললেন, তাঁর নাম গুণগান করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা উপমাও দিলেন। 'যেমন ধরো গাছে পাখি বসে থাকে। হাততালি দিলেই পাখি উড়ে যায়।'

গাছ হচ্ছে আমাদের শরীর। সেই গাছে পাপরূপ পাখি বসে আছে। ঈশ্বরের নামকীর্তন করলে পাপপাখি শরীর থেকে পালিয়ে যায়। আবার রামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ উপমা : 'পুকুরের জল সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে যায়, তেমনি ঈশ্বরের নামের তাপে পাপ-পুকুরের জলও শুকিয়ে যায়।'

কি অপূর্ব সব উপমা দিয়ে পরমপুরুষ আমাদের মনের সংশয় দূর করেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব আবার ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে বললেন, 'বর্ণের মধ্যে তিনটি স' কেন ?'

'শ, ষ, স। তিনটি সত্য বলার জন্য! সহ্ কর, সহ্ কর, সহ্ কর!'

যার সহ্ করার ক্ষমতা নেই, কোন সাধনাতেই সে সফল হতে পারে না। সেই কথারই অভিব্যক্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে :

'দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।'

॥ আঠারো ॥

ঈশ্বরের কথা ভাবতে গিয়ে, ঈশ্বরের পূজা করতে গিয়ে আমরা যে কত রকমের ভণ্ডামি করে যাচ্ছি তার শেষ কোথায়? ভণ্ডামি করে ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায় না। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সংসারী লোকের ব্যবহারটা একবার দেখছো? অনেকে আহ্নিক করবার সময়ে যত রাজ্যের কথা বলে। আবার কথা কইতে নেই বলে অনেকে মুখ বুজে কত রকম ইশারা করতে থাকে। কেউ কেউ আবার মালা টপকাতে টপকাতে মাছ দর করে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ঐ মাছটা।

'নারায়ণ পূজা হবে, পূজার আয়োজন সব হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বরের কথাটি নেই। কেবল সংসারের কথা। গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, কোথায় ঈশ্বরের কথা চিন্তা করবে, তা-না, যত রাজ্যের গল্প জুড়ে দেয়, তোর ছেলের বিয়ে কবে হলো, কি কি গয়না দিলে? দেখ দিকি, কোথায় গঙ্গাস্নান করতে এসেছে আর যত রাজ্যের সংসারের গালগল্প। বিশ্বাস নেই, তবু পাখি পড়ার মত করে যাচ্ছে জপ-তপ।'

আমাদের জপ-তপ, আহ্নিক, ঈশ্বর চিন্তা সব কিছুই এই পাখি পড়ার মত। কেবল কৃত্রিমের রূপচর্যা করে যাচ্ছি ঈশ্বরের পরিচর্যার ছলনায়। তাই তো আমরা দু'হাত জোড় করে ঈশ্বরকে প্রণাম জানাতে পারি না। প্রকৃষ্টরূপে তাঁর নাম করাই তো প্রণাম। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব অনবদ্য এক গল্প বললেন, ঘরের বেয়ান আর বাইরের বেয়ানের গল্প। রসাল ভঙ্গীতে গল্পটি তিনি ভক্তদের সামনে হাজির করলেন।

'এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন নানা'রঙের সুতো কাটছিলো। বাইরের বেয়ানকে দেখে ঘরের বেয়ান খুব

খুশি হলো। অনেকদিন পর বেয়ানকে পেয়ে সে জলখাবার তৈরি করতে গেল। যেই জলখাবার তৈরি করতে গেছে, সেই সুযোগে বাইরের বেয়ান একগাদা রঙিন সুতো বগলের নীচে লুকিয়ে রাখলো। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান বুঝতে পারলো বাইরের বেয়ানের কীর্তি। তখন সে একটা ফন্দী ঠাওরালো। বললো, আহা, কতদিন পর এলে, এসো আজ আমরা দু'জনে একটু আনন্দ করি। দুই বেয়ানে মিলে একটু নৃত্য করি। যেমন কথা তেমনি কাজ। দুই বেয়ান নাচতে শুরু করে দিল। ঘরের বেয়ান দেখলো যে বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই নৃত্য করছে।

'হাত না তুলে নৃত্য কি একটা নৃত্য হলো?

'ঘরের বেয়ান বললো, এমন আনন্দের দিনে এসো আজ আমরা হাত তুলে নাচি।

'ভাল কথা। কিন্তু বাইরের বেয়ান এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগলো।

'এ আবার কেমন নাচ?—ঘরের বেয়ান বললো, এসো আমরা দু'হাত তুলে নাচি।

'বাইরের বেয়ান কিন্তু সেই এক হাতের বগল টিপে আরেক হাত তুলেই নাচতে লাগলো।'

হরি সংকীর্তনে কি এক হাত তুলে নৃত্য করা যায়? এক হাত সংসারের দিকে রাখলে এবং আরেক হাত ঈশ্বরের দিকে রাখলে আমরা কি করে তাঁর কৃপা পাবো? আমাদের শুধু সরল আকুতি। আমরা দু'হাত দিয়েই ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ করবো।

গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যায়—সেই আনন্দেই আছি। তাই সুযোগ পেলেই গঙ্গাস্নান করি। কিন্তু শুধু গঙ্গাস্নানেই কি সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাবে? ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া পাপ দুরীভূত হয় না। পাপ কাজ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব কণ্ঠে রস এনে বললেন, 'গঙ্গাস্নান করলেই পাপ মুক্তি হয় না। আসলে গঙ্গা স্নানের আগে পাপগুলো তোমাকে ছেড়ে গঙ্গাতীরের গাছগুলোর উপর বসে থাকে। যেই তুমি গঙ্গাস্নান সেরে তীরে উঠেছো, অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে।'

তাই সংকল্প গ্রহণ করতে হবে—আমি জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করবো না, কোন পাপ কাজে লিপ্ত হবো না। যে অন্যায়টুকু, যে পাপটুকু করে ফেলেছি সেজন্য বার

বার তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি যে শাস্তি দেবেন তাই মাথা পেতে বরণ করে নেবো।

আমরা চাই তাঁর প্রতি অনুরাগ, চাই অচলা ভক্তি। সংসারের ছেলেমেয়েদের প্রতি আমাদের একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে। তাদের অসুখে-বিসুখে, আপদে-বিপদে আমরা কতই না চঞ্চল হয়ে পড়ি। তাদের কল্যাণের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সুদৃঢ় করার জন্য আমরা অস্থির হই না কেন? ঈশ্বরানুরাগের গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব। ভক্ত বিল্বমঙ্গলের গল্প। অননুকরণীয় ভঙ্গীতে।

'বিল্বমঙ্গল রোজ বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন বাড়িতে বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছিল, তাই বেশ্যালয়ে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। তা হোক। কাজ শেষ করে অনেক খাবার-দাবার নিয়ে চললো বিল্বমঙ্গল বেশ্যার কাছে। ছুটছে একেবারে দিশেহারা হয়ে। বেশ্যার উপর তার মন এত একাগ্র যে, কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তার কোন হুঁশ নেই। সেই পথে বসে চোখ বুজে ধ্যান করছিলো এক যোগীবর। তাকে মাড়িয়ে চলল বিল্বমঙ্গল। যোগীবর রেগে গিয়ে বললো, আমি ঈশ্বরের ধ্যান করছি, আর তুই কিনা আমাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস? তুই কানা নাকি?

'তখন বিল্বমঙ্গল বললো, আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? বেশ্যার কথা চিন্তা করতে করতে আমার হুঁশ ছিল না। কিন্তু আপনি ঈশ্বর চিন্তা করছিলেন অথচ আপনার তো দেখছি বাইরের সব হুঁশই ঠিক রয়েছে। এ কি রকম ঈশ্বর চিন্তা বলুন তো?

'এই ঘটনা থেকে বিল্বমঙ্গলের জ্ঞান হলো। সে বেশ্যাকে গুরু বলে স্বীকার করে ঈশ্বরলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করে চলে গেল। যাবার আগে সে বেশ্যাকে বলে গেল, কি করে ঈশ্বরে অনুরাগ স্থাপন করতে হয়, তা তুমিই আমাকে শিখিয়ে দিলে।'

বিল্বমঙ্গল বেশ্যাকে দেখলো ভগবতীরূপে। প্রিয়পাত্রকে লাভ করার জন্য আমাদের যে আকর্ষণ তার চেয়েও অনেক গভীর আকর্ষণ চাই ঈশ্বরের প্রেমলাভ করার জন্যে। ঈশ্বরপ্রেমের কথা বললেন পরমহংসদেব রসস্নিগ্ধ করে, 'যত রস জ্বাল দেবে ততই রিফাইন হবে। প্রথমে আখের রস—তারপর গুড় তারপর দোলো তারপর চিনি তারপর মিছরি এইসব। ক্রমে ক্রমে আরও রিফাইন হচ্ছে। কিন্তু খোলা নামবে কখন?'

খোলা নামবার জন্য চাই ইন্দ্রিয় সংযম। চেষ্টার ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে নিজেকে রিফাইন করবো, বিকশিত করবো। সংযম আর ভক্তির ভিতর দিয়েই তাঁকে লাভ করার চেষ্টা করবো। কবিগুরুর ভাষায় :

'আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবনব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখি তারা।'

ভালবাসার ভিতর দিয়ে, প্রেমের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কোমল হয়ে যান ; তাই আমরা শুধু তারই সেবা করে যাবো। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণকে না দেখে যশোদা পাগলের মত হয়ে শ্রীমতীর সান্নিধ্যে এলেন। শ্রীমতী তাঁর একাগ্রতা দেখে আদ্যাশক্তিরূপে দর্শন দিয়ে বললেন, মা, তুমি আমার কাছে বর চাও। যশোদা বললেন, কি আর বর চাইবো ! তবে এই বর দাও যেন মনে-প্রাণে শুধু কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। আমি আর এর বেশি কিছু চাই না।

আমরাও ঈশ্বরের কাছে শুধু এই বরই চাইবো, হে পরমমঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমার কাছে আমাদের অর্থ, মান, যশ কিছুই চাইবার নেই। তুমি শুধু আমাদের এই আশীর্বাদ কর যে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের যেন তোমার পাদপদ্মেই অচলাভক্তি থাকে। তাঁর প্রেমেই আমাদের উন্মাদ হতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যা কিছু দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই সব হবে। যখন ডাকবে, তখনই পাবে। প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন।'

প্রেমের রজ্জু দিয়ে বাঁধতে হলে ঈশ্বরানন্দে মাতাল হতে হবে। রামকৃষ্ণদেব রহস্য করে বললেন, 'ছেলে বলেছিলো, 'বাবা একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমাকে ছাড়তে বলতো ছাড়া যাবে।

'বাবা খেয়ে বললেন, তুমি বাছা ছাড়তে পার আপত্তি নাই—কিন্তু আমি আর ছাড়ছি না।'

তেমনি আমাকে ঈশ্বরানন্দে মাতাল হতে হবে।

আমার যা কিছু চাইবার তাঁর কাছেই চাইবো—যা কিছু পাবার তাঁর কাছ থেকেই পাবো। যা পাইনি তার জন্যে দুঃখ করবো না। তিনি যদি আমাকে

কিছু দিতে না চান তবে অন্যের কাছ থেকে কিছু পেয়েও আমি পাবো না। তাই প্রার্থনা আমার সতত তাঁর কাছেই। ছোট্ট একটি কাহিনীর ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব এই কথাই কি সুন্দর করে বলে গেছেন। কাহিনীটি হলো ·

'অনেকদিন আগের কথা। তখন মোগল যুগ। সে সময়ে এক মুসলমান ফকির বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করতো। তার একদিন ইচ্ছা হলো, অতিথি সৎকার করার। কিন্তু অতিথি সৎকারের জন্যে টাকা পয়সা তো চাই। ফকির এসে হাজির হলো দিল্লীর বাদশার কাছে। সেই বাদশার কাছে সাধু ফকিরদের অবারিত দ্বার। ফকির যখন সম্রাটের প্রাসাদে এসে হাজির হলো, তখন সম্রাট নমাজ পড়ছিলেন। ফকির নমাজের পাশের ঘরে এসে বসলো। সে লক্ষ্য করে দেখলো যে, নমাজের শেষে সম্রাট আল্লার কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, 'হে আল্লা! আমাকে ধন দাও, দৌলত দাও।

'এই প্রার্থনা শুনে চলে যাবার উদ্যোগ করলো ফকির। সম্রাট তাকে ইশারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা, জিজ্ঞেস করলেন, আপনি চলে যাচ্ছিলেন কেন? ফকির বললো, সে কথা আর বাদশার শুনে কাজ নেই। আমি চলি।

'বাদশা অনেক জেদ করাতে ফকির বললো, আমি কিছু টাকা পয়সা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম আপনার কাছে, অতিথি সৎকারের জন্যে।

'তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন?—জিজ্ঞেস করলেন সম্রাট।

'ফকির বললো, যখন দেখলুম আপনিও ধনদৌলত ভিখারী, তখন মনে করলুম, ভিখারীর কাছে প্রার্থনা করে আর কি লাভ? চাইতে হয়তো আল্লার কাছেই চাইবো।'

ঈশ্বর আমাদের যা দেবেন তা-ই আমরা নেবো নতশিরে। দুঃখ পেলেও আমরা ভাববো, এ ঈশ্বরের নিবিড় আলিঙ্গন ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাকে যা দেবার ঈশ্বর আগে থেকেই ঠিক করে রাখেন। কিন্তু পার্থিব জিনিস পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরা আনন্দের আতিশয্যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ি। কিন্তু ঈশ্বরের অনুকম্পা না হলে কিছুই হবার নয়। বড়পদ তিনিই দিয়েছেন। লোকে ভাবে, আমরা কি বড়লোক!—কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার কথা একবারও চিন্তা করে না। রামকৃষ্ণদেব একটি রমণীয় উপমা দিয়ে বললেন, 'ছাদের জল সিংহের মুখঅলা নল দিয়ে পড়ছে দেখে যেন মনে হয় সিংহের মুখ থেকেই জল পড়ছে। কিন্তু দেখ, কোথাকার জল! আকাশে মেঘ হলো। তাতে

বৃষ্টি পড়লো। বৃষ্টির জল ছাদে এসে পড়লো। সেই জল গড়িয়ে নল দিয়ে যাচ্ছে আর সিংহের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে।'

ঈশ্বর আমাদের যা দেবেন তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। একটা কিছু পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরা যেন আনন্দের আতিশয্যে একেবারে উদ্বেল হয়ে না পড়ি। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব অনবদ্য একটি চিত্র আঁকলেন।

'একখানি সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। এতে তাদের পেট ভরত না। একদিন সরাখানি হঠাৎ ভেঙে গেল। এতে বৌয়েরা খুব খুশি হলো। তা দেখে শাশুড়ী বললো, তোমরা নাচ আর কোঁদো—যাই কর বৌমা, আমার হাতের আটকেল কিন্তু ঠিক আছে।'

ঈশ্বরেরও হাতের আন্দাজ ঠিক আছে। যাকে যা দেবার তিনিই পরিমাপ করে দেবেন—এ নিয়ে আমরা ঈর্ষাকাতর হয়ে কি করবো? আমরা যা পাইনি তার জন্যে দুঃখ করবো না—যা পেয়েছি তাইতো আমার কাছে ঈশ্বরের অন্তহীন আশীর্বাদ।

॥ উনিশ ॥

রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'হাতি অন্যের কলা গাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে মাহুত ডাঙশ মারে।'

ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। যখনই ভোগের দিকে মন যেতে চাইবে, তখনই ডাঙশ মেরে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করতে হবে। এ সম্পর্কে মনোরম একটি চিত্র আঁকলেন রামকৃষ্ণদেব :

'এক চাষী তার ক্ষেতে জল সিঞ্চন করছে। সারাদিন জলসেচ করে সন্ধ্যার সময়ে সে মনে করলো, একবার দেখে আসি জমিটা কতটুকু ভিজলো। এসে দেখে খালের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে। এক ছটাক জমিও ভেজেনি।'

এই গর্ত আর কিছুই নয়, সংসারী লোকের বিষয়বুদ্ধির গর্ত। অনবরত জপ-তপ করছি, কিন্তু সে রকম ফল পাচ্ছি কোথায়? কিছুই তো অনুভব করতে পারছি না। পদে পদে আসে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে গিয়ে পদে পদে যে বিষয়-বুদ্ধির চিন্তা করছি তার হিসাব রাখছি কোথায়? জল সিঞ্চনের আগে আমাদের দেখে নিতে হবে আলটা ঠিক আছে কিনা—আলে

কোন গর্ত আছে কিনা। তা নয়তো শুধু জল সিঞ্চন করে কি লাভ হবে? একটি উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণদেব আরও পরিষ্কার করে দিলেন কথাটা। তিনি বললেন, 'খই ভাজার সময়ে যে খইটা খোলার উপর থেকে বাইরে ঠিকরে পড়ে যায় তাতে কোন দাগ লাগে না। কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোন না কোন জায়গায় কালো দাগ লাগবেই।'

আমরাও খোলার উপর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবো যাতে গায়ে কোন কালিমা না পড়ে।

আবার উপমার উপর উপমা। উপমা রামকৃষ্ণস্য। একের পর এক উপমা সাজিয়ে রামকৃষ্ণদেব ভক্ত মনে ভাবরসের সঞ্চার করলেন।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে ফেলে, কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।'

আমরাও আকাশের মত নির্মল হবো। সংসারে পাপের মধ্যে বসবাস করেও আমাদের গায়ে যাতে কোন পাপ এসে স্পর্শ করতে না পারে—এ আকুল আর্তি রাখবো করুণাময় ঈশ্বরের কাছে।

পরমপুরুষ বললেন, 'শাস্ত্রে আছে, আপো নারায়ণঃ অর্থাৎ জল নারায়ণ; কিন্তু কোন জল ঠাকুর সেবায় লাগে, আবার কোন জলে আঁচানো, বাসনমাজা, কাপড় কাঁচা এ সমস্ত কাজ চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবায় চলে না। তেমনি অসাধু, ভক্ত—অভক্ত সকলের হৃদয়েই নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত কিংবা দুষ্টলোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না—মাখামাখি চলে না। কারো সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে। আবার কারো সঙ্গে তাও চলে না। এইরূপ লোকের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়।'

এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উক্তি একেবারে পরিষ্কার। ঈশ্বর ভাল-মন্দ দুই-ই সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈশ্বর মন্দলোক সৃষ্টি করলেন কেন? মন্দ না থাকলে ভালোর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। তাই তিনি ভাল-মন্দ আলো-আঁধার সৃষ্টি করেছেন আমাদের সংযত করবার জন্য, আমাদের সাবধান করে দেবার জন্য।

আবার মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে। কেউ একেবারে নাস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। কারো কারো আবার ঈশ্বরে সামান্যতম বিশ্বাস থাকলেও মাঝে মাঝে তা হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ আছেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী অথচ সৎচিন্তা

করেন না। আবার কেউ কেউ আছেন সব সময়ে ঈশ্বরে মন রেখে সংসার করেন। ঈশ্বরের প্রতি তাদের অচলাভক্তি। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একদিন মনোজ্ঞ একটি গল্প বললেন।

'এক বড়লোকের একটা হীরের টুকরো ছিল।

'তিনি তার চাকরকে হীরেটি দিয়ে বললেন, বাজারে গিয়ে এর দর যাচাই করে এসো। প্রথমে যাও বেগুনঅলার কাছে। সে কি দর বলে আমাকে এসে জানাবে।

'চাকর হীরে নিয়ে বেগুনঅলার কাছে গেল। বেগুনঅলা হীরেটি নেড়েচেড়ে বললো, ভাই এর বিনিময়ে আমি নয় সের বেগুন দিতে পারি।

'চাকরটি বললো, ভাই, আরেকটু ওঠ, না হয় অন্ততঃ দশ সের বেগুনই দাও।

'উত্তরে বেগুনঅলা বললো, আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি, এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে দাও।

'চাকরটি ফিরে এসে বাবুকে বললো, বেগুনঅলা নয় সেরের বেশি বেগুন কিছুতেই দেবে না। বলে, সে নাকি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছে।

'বাবু বললেন, বেশ, এবার কোনো এক কাপড়অলার কাছে যাও। কাপড়-অলার পুঁজি একটু বেশি। দেখ, সে কি বলে।

'চাকর এক কাপড়অলার কাছে এসে হাজির হলো। হীরেটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে কাপড়অলা বললো, হ্যাঁ, জিনিসটা মন্দ নয়, এতে ভাল গয়না হতে পারে। তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

'চাকরটি বললো, তুমি আরেকটু বাড়াও, অন্ততঃ হাজার টাকা দাও তাহলে জিনিসটা ছেড়ে দিই।

'না ভাই, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশিই বলে ফেলেছি, আর পারবো না।

'চাকর ফিরে এল। মনিবকে সে সব কথা খুলে বললো।

'মনিব বললেন, এবার তবে জহুরীর কাছে যাও। সে কি দর দেয় দেখা যাক।

'চাকর তাই গেল। জহুরী একটুখানি দেখেই বললো, আমি লাখ টাকা দেবো।'

যার যেমন পুঁজি সে সেরকম দর দেয়। যারা নাস্তিক, ঈশ্বর চিন্তা করে না, তারা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। স্বয়ং ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে

আসেন, তখন তাঁদের মানুষ ভেবে সাধারণে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যাদের আধ্যাত্মিক সচেতনতা আছে তারা ঠিক চিনতে পারে। কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মনীষীরা রামকৃষ্ণদেবকে ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। আবার রামকৃষ্ণদেবও বিবেকানন্দকে এক পলক দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। তাই আমরাও জহুরী হবার চেষ্টা করবো।

অহংকারই আমাদের পতনের কারণ। অহংবোধ বর্জন করতে না পারলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে কি করে? এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব পঞ্চ-পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান যাত্রার কাহিনীটি ভক্তদের কাছে বললেন।

'পঞ্চপাণ্ডব চলেছে মহাপ্রস্থানের পথে। যেতে যেতে প্রথমে পড়ে গেল সহদেব।

'ভীম জিজ্ঞেস করলো, সহদেবের পতনের কারণ কি?

'যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত তার মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সেই অহংকারেই তার পতন।

'তারপর পড়ে গেল নকুল। নকুল পড়লো কেন?

'নকুল ভাবত যে, তার মত রূপবান আর কেউ নেই এই জগতে—সেই অহংকারে তার বিনাশ হল।

'তারপর অর্জুনের পতন।

'অর্জুন ভাবে, আমার মত বড় ধনুর্ধর আর কেউ নেই এই তার অপরাধ।'

'তারপর ভীম। 'ভীম জিজ্ঞেস করলেন, আমি কেন পড়লুম?

'যুধিষ্ঠির বললে, তুমি অতিরিক্ত ভোজন কর, অন্যের শক্তি উপেক্ষা করে নিজের শক্তির বড়াই কর—সেই কারণে।

'স্বশরীরে স্বর্গে গেলেন যুধিষ্ঠির।'

আমি ভেবে বসে আছি, আমার মত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আর কে আছেন? আমাদের আছে বিদ্যার অহংকার, অর্থের অহংকার, আভিজাত্যের অহংকার। অহংকার যতদিন আছে, ঈশ্বর সান্নিধ্যও ততদিন দূরে থাকে। সুন্দর একটি চিত্রকল্প রচনা করে রামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন কথাটা। তিনি বললেন, 'সন্ধ্যার পর জোনাকিরা মনে করে, আমরাই জগৎকে আলো দিচ্ছি। তারপর যেই আকাশে তারা উঠলো জোনাকির আলো ম্লান হয়ে গেল। তখন তারাগুলো ভাবলো, আমরাই জগৎকে আলো দিচ্ছি। তারপর চাঁদ উঠলো, আকাশে। নিমেষে তারাগুলো ম্লান হয়ে গেল লজ্জায়। চাঁদ মনে করলো, আমারই তো জয়

অন্ধকার। আমার আলোয় জগৎ উদ্ভাসিত। দেখতে দেখতে অরুণোদয় হলো। সূর্য উঠলে কোথায় বা চাঁদ, কোথায় কি!'

আমাদের চারিদিকে অহংকারের বেড়া, মায়ার বেড়া। তাই সাধুসঙ্গে আমরা আনন্দ পাই না। সাধুসঙ্গে গিয়েও মন পড়ে থাকে কামিনীকাঞ্চনের দিকে। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি মজার কাহিনী শোনালেন।

'এক মেছুনি এক মালিনীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। মাছ বিক্রি করে এসেছে, তাই মাছের চুপড়িটিও সাথে আছে। মালিনী রাতে তাকে ফুলের ঘরে শুতে দিল। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল—ফুলের গন্ধে মেছুনির কিছুতেই ঘুম হয় না। মালিনী মেছুনির ঘুম হচ্ছে না বুঝতে পেরে তাকে জিজ্ঞেস করলো, কিগো, ছটফট করছো কেন?

'মেছুনি বললো, কে জানে, হয়তো ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না। আমার আঁশচুপড়িটা এনে দিতে পার? তাহলে বোধহয় ঘুম হতে পারে।

'শেষ পর্যন্ত আঁশচুপড়িটা আনাতে হলো। জলছিটে দিয়ে নাকের কাছে রাখতেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতে লাগলো মেছুনি।'

আঁশচুপড়ি আর কিছুই নয়—কামিনীকাঞ্চনের সংসার। পুষ্পশয্যা হচ্ছে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে গিয়েও আমাদের মন পড়ে থাকে কামিনীকাঞ্চনে। আমরা মনে করি তাতেই আনন্দ—তাতেই সুখ। কিন্তু একবার সাধুসঙ্গে যথার্থ আনন্দ পেলে সংসার তখন আলুনি বোধ হয়। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো? সব ভাসাভাসা। খুড়ি জেঠির কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, আমার ঈশ্বরের দিব্য। আবার কোন ফিটবাবু পান চিবুতে চিবুতে স্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু বিষয়ীর এই ভাব ক্ষণিকের।'

আমরা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য বলে উঠি, ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন—এই পর্যন্তই।

তারপর সংসারের কলকাকলিতে মেতে উঠি। ঈশ্বরের জন্য চাই তীব্র বৈরাগ্য। চাই রাগভক্তি।

আবার কি মনোরম একটি কথার নকশা আঁকলেন রামকৃষ্ণদেব। বললেন, 'একটি মেয়ের ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটি খুলে কাপড়ের আঁচলে বাঁধলো। তারপর, ওগো! আমার কি উপায় হবে গো!—বলে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু খুব সাবধানে, নৎটা যাতে ভেঙে না যায়।

ঈশ্বরের জন্য আমাদের কান্না এলেও নৎটা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর। নৎ আর কিছুই নয়—আমাদের ভোগের বাসনা। ঈশ্বরকে মাঝে মধ্যে ডাকছি ঠিকই—কিন্তু তাতে আমাদের আন্তরিকতা কোথায়?

ঈশ্বরের নামে যদি কপটতাও করি, তবে বার বার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে আমার চরিত্রের ওই ত্রুটি অনেকটা সংশোধন করে নিতে পারি। বাল্মীকি 'মরা মরা' বলেই রামনাম উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতেই একদিন আমার কপটতাকে আলুনি বোধ হবে। আমি সত্যি সত্যি উৎরে যেতে পারবো। এ সম্পর্কে অমৃতময় পুরুষ একটি রসাশ্রিত গল্প বললেন।

'এক ছিল জেলে। সে রাত্রিবেলা অন্য লোকের পুকুর থেকে মাছ চুরি করতো। একদিন রাত্রে সে এক বাড়ির পুকুরে জাল ফেলেছে। কিন্তু যার পুকুর সে সজাগ ছিল। জালের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ শুনেই সে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। অমনি লোকজন এসে হাজির হলো সেই পুকুর পাড়ে। চারদিকে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকজন তখন মশাল নিয়ে এলো।

'জেলেটি ধরা পড়বে ভেবে খুব ঘাবড়ে গেল। অমনি তার মাথায় এসে গেল একটা ফন্দী। সে তাড়াতাড়ি গায়ে হাতে পায়ে ছাই মেখে সাধু সেজে বসে রইলো একটা বড় গাছের নীচে।

'গৃহস্থ লোকজন নিয়ে চোর খুঁজতে এসে দেখে গাছতলায় এক সাধু বসে আছেন। সাধু চোখ বুজে গভীর ধ্যানে মগ্ন। সাধুর ধ্যান ভঙ্গ করলে বিরক্ত হতে পারেন ভেবে লোকজন সবাই চুপচাপ চলে গেল।

'পরের দিন সারা গ্রামে রটে গেল যে, এক বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু এসেছেন গ্রামে। গাছের নীচে বসে ধ্যান করছেন। শুনে সবাই ছুটে আসতে লাগলো সাধু দর্শনে। সাধুকে প্রণাম করতে। অনেকে ফুল ফল মিষ্টি এনে দিতে লাগলো। অনেকে প্রণামী হিসেবে টাকা-পয়সাও এনে দিতে লাগলো।

'ব্যাপার স্যাপার দেখে সাধু ভাবতে লাগলো, আমি একজন কপট সাধু। তবু আমাকে সবাই এত ভক্তি করছে! আমি যদি সত্যি সত্যি সাধু হতাম তাহলে তো ঈশ্বর দর্শন করতে পারতাম। জেলে সংসার ছেড়ে চলে গেল।'

যদি একবার চৈতন্য হয়, যদি একবার কেউ ঈশ্বরে আনন্দ পায়, তাহলে আর বিষয় আসয়ের প্রতি তেমন আসক্তি থাকে না। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'বিকার থাকলে রোগী কত কি বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো, আমি এক জালা

জল খাবো। বৈদ্য বলে, খাবি বইকি! নিশ্চয়ই খাবি। এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে রোগী কি বলবে তার জন্য অপেক্ষা করে।'

এই সংসারে আমরাও বিকারগ্রস্ত। আমাদেরও চাই উপযুক্ত গুরুরূপী বৈদ্য। তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন। একবার যাকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছি, কোনদিন তাঁর দোষ-ত্রুটি ধরতে যাবো না। তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের পথ দেখাবেন। তিনিই আমাদের কাছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বললেন অপূর্ব ব্যঞ্জনায়।

'এক গুরু পুত্রের অন্নপ্রাশন হবে—শিষ্যরা যে যেমন পারে উৎসবের জন্য আয়োজন করতে লাগলো। সেই গুরুর ছিল এক বিধবা শিষ্যা। আপনজন বলতে তার কেউ নেই। কেবল তার আছে একটা গরু। সে একঘটি দুধ এনে দিলো গুরুদেবকে উৎসবের জন্য। গুরু ভেবেছিলো, এই বিধবা তার ছেলের অন্নপ্রাসনের সমস্ত দুধের দায়িত্ব নেবে। মাত্র একঘটি দুধ দেখে গুরু বিরক্ত হয়ে শিষ্যকে বললেন, তুই জলে ডুবে মরতে পারিস না?

'বিধবা ভাবলো—এটাই বোধহয় গুরুর আদেশ। তাই সে নদীতে ডুবে মরতে গেল। তখন স্বয়ং নারায়ণ তাকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমার আন্তরিকতায় আমি খুশি হয়েছি। তুমি এই পাত্রটা নাও। এতে দই আছে। যত ঢালবে ততই দই বেরুবে। এতে তোমার গুরু খুশি হবেন।

'গুরু তো সেই পাত্র দেখে একেবারে অবাক! তার চেয়েও অবাক বিধবার মুখে অদ্ভুত কথা শুনে।

'গুরু বললেন, তুমি যদি আমাকে নারায়ণ দেখাতে না পার তাহলে আমিই নদীতে ডুবে মরবো।

'দু'জনে পুনরায় নদীর তীরে এলো। বিধবার কাতর অনুরোধে নারায়ণ এসে আবার দেখা দিলেন, কিন্তু গুরু দেখতে পেলো না। বিধবা আবার নারায়ণের কাছে কাতর অনুরোধ জানিয়ে বললো, আপনি যদি গুরুদেবকে দেখা না দেন তবে আমিও গুরুদেবের সঙ্গে এই নদীতে ডুবে মরবো।

'তখন নারায়ণ গুরুকে একপলক দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।'

যিনি দীক্ষা দেন তিনিই গুরু। গুরুর প্রতি চাই ঐকান্তিক বিশ্বাস। তাহলে গুরুর চেয়েও বড় হওয়া যায়। ঈশ্বরই সব। গুরু নিমিত্তমাত্র। রামকৃষ্ণদেব একটি উপমা দিয়ে বললেন, 'বাড়িতে ভিক্ষুক এলে একটি বাচ্চা ছেলে তাকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। কিন্তু রেলভাড়া দিতে হলে কর্তা ছাড়া উপায় নেই।'

স্বয়ং কর্তার কৃপা লাভই আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি যাঁকে গুরুরূপে আমার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁকেই ঈশ্বরের দূত বলে মেনে নিতে দোষ কি?

রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'মন হচ্ছে ধোপা ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও—লাল, নীলে ছোপাও—নীল, সবুজে ছোপাও—সবুজ। দেখ না, যদি একটু ইংরেজী পড়া শিখলে মুখে অমনি ইংরেজী কথা এসে পড়ে। ফুটফাট্ ইটমিট কত কি! আবার পায়ে বুট জুতো, তখন শিস্ দিয়ে গান গাইতে ইচ্ছা করবে। আবার পণ্ডিত যদি সংস্কৃত পড়ে, অমনি কথায় কথায় শ্লোক ঝাড়ে।'

যেটুকু শিখেছি পড়েছি তার কতই না জাহির করছি—কত বিচার করছি। কিন্তু আমি কতটুকুই বা জানি? আমার শুধু এইটুকু জানা দরকার যে, তিনি আছেন।

যতক্ষণ আমাদের স্বার্থের ব্যাপার জড়িত নেই, ততক্ষণ পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতে বেশ আছি। কিন্তু যেখানেই লাভ করতে যাই, সেখানেই লোভ এসে পড়ে। লোভের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক নীচুতে নেমে যাই। রামকৃষ্ণদেব পরিহাসচ্ছলে বললেন, 'কুকুরগুলো গা চাটাচাটি করে। পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি দুটো ভাত ফেলে দেয় তাহলেই কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যায়।'

রামকৃষ্ণদেব আবার কি রসস্নিগ্ধ করে বললেন, 'জানো, মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে। মায়ের মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন আলাদা।'

কি মনোজ্ঞ করে বললেন পরমপুরুষ! আমাদের মত এক পথ এক হওয়া সত্ত্বেও আমরা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরছি।

রামকৃষ্ণদেব তরল পরিহাস করে আবার বললেন, ভক্ত সঙ্গে কেউ কেউ দক্ষিণেশ্বরে আসে নৌকো করে। তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি। তাদের কাছে ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। কেবল ছট্‌ফট্ করে। বারবার ভক্ত বন্ধুটির কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, কখন উঠবি?

'যখন দেখলো, বন্ধুটি কোন প্রকারেই উঠছে না, তখন বিরক্ত হয়ে বললো, 'তবে তোমরা কথা কও, আমি নৌকোয় গিয়ে বসি।'

আবার রামকৃষ্ণদেবের পরিহাসমিশ্রিত উক্তি! তিনি বললেন, 'যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নেই, তাদের আমি বলি তোমরা বিল্ডিং দেখগে।'

মন্দিরে এসেছি ঠাকুর দর্শনে। তাঁর কথা চিন্তা করতে—তাঁর ধ্যান করতে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই সে উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছি। চারিদিকের সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং আমার মন কেড়ে নিয়েছে। তাই গড়ে তুলতে চাইছি ধন। যশ আর প্রভাব প্রতিপত্তির বিল্ডিং। ঈশ্বর কিন্তু সে বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে।

॥ কুড়ি ॥

আমরা উদ্‌ভ্রান্তের মত দিগ্‌বিদিক্ ছুটে বেড়াচ্ছি, কোথায় ঈশ্বরের সন্ধান পাবো! কোথায় খুঁজে পাবো অনাবিল শান্তি! গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরে এলাম—নয়ন মেলে কত কি দেখে এলাম। কিন্তু সত্যিকারের শান্তি পেলাম কোথায়? কে আমাকে দেখিয়ে দেবে সেই আনন্দময় সত্তাকে? রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী আছে। তা জানে না হরিণ। গন্ধে দশদিক আমোদিত হচ্ছে দেখে উন্মনা হয়ে ছুটে বেড়ায় সে। অথচ নিজের নাভির মধ্যেই যে সুগন্ধের উৎস—একথা কে তাকে বলে দেবে?'

এক আনন্দময় সত্তা অধিষ্ঠিত রয়েছেন আমাদেরই অন্তরে। সে খবর আমরা রাখি না। সেজন্য আমরা দিগ্‌বিদিক্ উদভ্রান্তের মত ছুটে চলেছি। অপূর্ব উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।'

আমাদের অন্তরে যে মাণিক রয়েছে তার সন্ধান কোনদিন করেছি কি? আমরা অমৃতের পুত্র। সেই যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। একটি রসাশ্রিত গল্পের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণদেব আমাদের অন্তরেই ঈশ্বর সন্ধানের ইঙ্গিত করলেন। গল্পটি হলো:

'একজন তামাক খাবে তো প্রতিবেশীর বাড়িতে টিকে ধরাতে গেল। তখন গভীর রাত। প্রতিবেশীর বাড়ির সবাই ঘুমে অচেতন। অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠেলাঠেলির পর প্রতিবেশী দরজা খোলার জন্য নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হলে প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করলো, কিহে, কি মনে করে এত রাত্রে? কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো?

'লোকটি বললো, আরে ভাই, আর কি মনে করে! জানোই তো আমার তামাকের নেশা আছে। ঘুম আসছিলো না। হঠাৎ তামাক খেতে খুব ইচ্ছা হলো। তাই টিকে ধরাবো মনে করে তোমার বাড়ি এলাম।'

'তখন প্রতিবেশী বললো, বা, তুমি তো বেশ লোক! এত কষ্ট করে এই শীতের রাতে এখানে এসেছো আর দরজা ঠেলাঠেলি করছো। তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে।'

আমরাও তেমনি লণ্ঠন হাতে করে টিকের আগুনের সন্ধানে এখানে সেখানে

ঘুরে বেড়াচ্ছি। হাতের লণ্ঠনটির কথা একবারও চিন্তা করি না। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যতক্ষণ বোধ সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন বোধ হেথা হেথা তখনই জ্ঞান।'

মন স্থির না হলে ঈশ্বরের কথা বলে কিছু লাভ হয় না। মন স্থির করবার জন্য চাই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা—চাই সাধনা। ক্ষণিকের চেষ্টায় ঈশ্বর লাভ করা যায় না। পরমপুরুষ বললেন, 'একদিনেই কি নাড়ি দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ঘুরতে হয়। তখন কোনটা কফের, কোনটা বায়ুর, কোনটা পিত্তের নাড়ি বলা যায়। যাদের নাড়ি দেখা ব্যবসা তাদের সঙ্গ করতে হয়।'

ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ করতে চেয়েছি, অথচ সাধুসঙ্গ করবো না—এ কেমন করে হয়? সাধুসঙ্গ করতে হবে আর নির্জনে বসে তাঁর চিন্তা করতে হবে—তবেই তো তাঁকে জানার পথের সন্ধান পাবো। অপূর্ব একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'অমুক নম্বরের সুতো, যে সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা কর, যারা সুতোর ব্যবসা করে তাদের দোকানে কিছুদিন থাক, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, আর কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতো তা ঝাঁ করে বলে দিতে পারবে।'

ঈশ্বরের স্বরূপ সবাই বলতে পারেন না। আমি শুধু তাঁর কৃপাপ্রার্থী হতে চাই। যাঁরা সাধনমার্গে অনেক উঁচু স্তরে উঠেছেন তাঁদের কাছ থেকেই জেনে নিতে হবে পথের সন্ধান। তাঁরাই হবেন সত্যিকারের পথপ্রদর্শক।

শুধু কি ধ্যান করার সময়েই করবো ইষ্ট চিন্তা? অন্য সময়ে সংসার চিন্তা? পরমহংসদেব বললেন, 'দেখেছো তো, দুর্গা পূজার সময়ে একটা জাগ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়—সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। সেই রকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে বসিয়ে রেখে তাঁর চিন্তারূপ জাগ-প্রদীপ সর্বদা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সংসারে কাজ করতে করতে লক্ষ্য রাখতে হয় সেই প্রদীপটি জ্বলছে কিনা।'

আমার অন্তরে সেই ঈশ্বর প্রেমের প্রদীপটি অনবরত জ্বালিয়ে রাখবো।

ঈশ্বর চিন্তা করবার জন্য প্রথমেই মনস্থির করা প্রয়োজন। মনস্থির করতে পারলেই বায়ুস্থির হয়। চঞ্চল মন নিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করা যায় না। রামকৃষ্ণদেব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, 'একজন মহিলা ঝাঁট দিচ্ছিলো। সে সময়ে একজন লোক এসে বললো, ওগো, অমুক নেই, মারা গেছে। যে মহিলাটি ঝাঁট দিচ্ছিলো, তার যদি একান্ত আপনার জন না হয়, সে ঝাঁট দিতে থাকে আর

মাঝে মাঝে বলে, আহা! লোকটা মারা গেল! বেশ ছিল! এদিকে ঝাঁটার কাজও চলে। আর যদি আপনার লোক হয়, তবে হাত থেকে ঝাঁটা খসে পড়ে যায়। আর এঁ্যা, কি সর্বনাশ। বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। তখন তার বায়ুস্থির হয়ে যায়। কোন কাজ বা চিন্তা আর সে তখন করতে পারে না।' আবার কি রসাশ্রিত ভঙ্গীতে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'মেয়েদের ভেতর দেখনি? যদি কেউ অবাক হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শোনে, তখন অন্ত মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানেও বায়ুস্থির হয়েছে। তাই অবাক হয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে।'

মনস্থির করতে পারলে তবেই বায়ুস্থির হয়। সেজন্ত চাই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

নির্জনে বসে চিন্তা না করলে সহজে মনস্থির হয় না। সংসারে নানা ঝামেলা। তাই মাঝে মাঝে নির্জনে বসে তাঁর চিন্তা করতে হয়। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'চাল কাঁড়তে হলে একা বসে কাঁড়তে হয়। মাঝে মাঝে চাল হাতে নিয়ে দেখতে হয় কেমন কাঁড়া হয়েছে। চাল কাঁড়া অবস্থায় কেউ যদি পাঁচবার ডাকে আর উঠে আসতে হয়, তবে কি করে চাল ভালভাবে বাছা হবে?'

চাল কাঁড়া হচ্ছে ঈশ্বরের চিন্তা করা। ঈশ্বরের চিন্তায় যদি বারবার বাধা পড়ে তবে কিভাবে মনস্থির হবে?

আবার রামকৃষ্ণদেবের উপমা। একের পর এক উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণদেব ভক্তের মনে মননের বীজ রোপণ করতে চান। তিনি বললেন, 'দই নিরিবিলিতে পাততে হয়। মনরূপ দুধ থেকে একবার জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা যায় তাহলে সংসাররূপ জলে ফেলে রাখলেও তা ভাসতে থাকে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায় অর্থাৎ দুধের স্তরে জলে রাখতে গেলে দুধে জলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।'

নির্জনে বসে ঈশ্বরের চিন্তা না করলে মন শুকনো হয়ে যায়। আবার রামকৃষ্ণদেবের কি মনোহর উপমা। তিনি বললেন, 'এক ভাঁড় জল আলাদা করে রাখলে তা শুকিয়ে যায়, কিন্তু গঙ্গাজলের মধ্যে সেই ভাঁড় ডুবিয়ে রাখলে শুকাবে না।'

আমাদের মন যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য অহর্নিশ ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে মনকে রসস্নিগ্ধ করে রাখার চেষ্টা করতে হবে। সব সময়ে ঈশ্বরের কথা চিন্তন এবং মননেই আমার আনন্দ। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তার মহিমার কথাই বলতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার

কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে মুখ দিয়ে লালা পড়ে। আর কেউ যদি ছেলের সুখ্যাতি করে তো কথাই নেই, অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল এনে দে।'

ঈশ্বরের হাতে রয়েছে আলোকবর্তিকা। সেই আলোকবর্তিকায় চারিদিক সমুদ্ভাসিত। আমরা এত কিছু দেখছি, অথচ দেখতে পাচ্ছি না ঈশ্বরকে। তিনি কিন্তু আমাদের সবাইকেই দেখতে পাচ্ছেন। আমরা রয়েছি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। রামকৃষ্ণদেব মনোজ্ঞ একটি উপমা দিয়ে বললেন, 'সার্জন সাহেব আঁধার রাতে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়, তার মুখ দেখতে পায় না কেউ। কিন্তু ঐ আলোতে তিনি সবার মুখ দেখতে পান। কেউ যদি দেখতে চায় সার্জনকে তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়, বলতে হয়, সার্জন সাহেব! কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের দিকে ফেরাও, তোমাকে একবার নয়নভরে দেখে নিই।'

আমরাও ঈশ্বরের কাছে আমাদের আকুল আর্তি জানিয়ে বলবো, হে ঈশ্বর! তুমিও একবার আলোটি তোমার মুখের উপর ফেলো। জীবন সার্থক করে মুহূর্তের জন্য দেখে নিই তোমার নয়ন ভোলানো আনন্দঘন মূর্তিটি। তাই আমাদের আকুল প্রার্থনা:

"অসতো মা সদ্গময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যোর্মামৃতং গময়ঃ।"...

'তুমি আমাদের অসত্য থেকে সত্যের পথে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে চল, মৃত্যু থেকে অমৃতময় ধামে নিয়ে চল।'

কিন্তু আমাদের অহংকার না গেলে তিনি প্রকাশিত হবেন কিভাবে? কিভাবে দেখতে পাবো তাঁর জ্যোতির্ময়রূপ? আমি তো আমাকে নিয়েই গর্ববোধ করছি। আমার কথাই বলছি। তাঁর কথা বলছি কোথায়? আমার চিন্তায় ও মননে সে গভীরতা কোথায়? তিনিই তো সর্বদিকে প্রকাশিত—সব দিকে বিরাজিত। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—জগতে যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। তবে কেন আমার মধ্যে অহংবোধ? আমি কিসের গর্ব করি? আমার অস্তিত্ব কোথায়? সবকিছুই যে তুমিময়। ভাবগম্ভীর এক গল্প কথনের মধ্য দিয়ে পরমপুরুষ বিস্তৃত করলেন তাঁর গভীর প্রজ্ঞার ছায়া।

'এক গুরু শিষ্যকে বললেন, অরণ্যে গিয়ে তপস্যা করে সিদ্ধ হও।

'শিষ্য বারো বৎসর কঠোর তপস্যা করে ফিরে এলো গুরুর কাছে। দেখলো, গুরুর গুহাদ্বার রুদ্ধ। দরজায় করাঘাত করলো শিষ্য। ভিতর থেকে গুরু প্রশ্ন করলেন, কে?

'শিষ্য উত্তর দিলো, আমি।

'কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন গুরুদেব; বললেন, তোমার তপস্যা এখনো পূর্ণ হয়নি। সিদ্ধি এখনো বহু দূরে।

'শিষ্য আবার দুঃসাধ্যতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলো। কাটলো আরো বারো বছর। আবার ফিরে এলো গুহাদ্বারে। দেখলো, এবারও দ্বার রুদ্ধ। সে দ্বারে করাঘাত করলো।

'গুরু প্রশ্ন করলেন, কে?

'শিষ্য উত্তর দিলো, তুমি। অমনি মুক্ত হলো গুহাদ্বার।'

'তুমি' ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছুই নেই। তুমি, তুমি—সর্বত্র তুমিময়। হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা! বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, চরাচরের যাবতীয় জিনিস—বাড়িঘর, পরিবার, পরিজন সব তোমার। আমি তোমার দাসানুদাস। আমার আমিত্ব লোপ করে তোমার মধ্যে বিলীন করে দাও।

॥ একুশ ॥

যদি জগতের সব কিছুর মূলে ঈশ্বর থেকে থাকেন তবে আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি না কেন? এই প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে অগণিত তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর মনে। এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিয়েছেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেব সুন্দর এক গল্প কথায়।

'শ্বেতকেতু পিতা আরুণিকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই যদি জগতের মূলে ঈশ্বর থেকে থাকেন, তবে আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না কেন?

'আরুণি বললেন, এই নুন নাও। এক পাত্র জল নিয়ে তাতে ফেলে দাও। কাল প্রাতে আবার এসো।'

'প্রভাতে দেখা করতে এলো শ্বেতকেতু। আরুণি বললেন, 'বৎস! রাত্রে যে নুন জলে ঢেলে দিয়ে এসেছিলে সেই নুন নিয়ে এসো।

'নুন আনতে না পেরে শ্বেতকেতু জলের পাত্রটিই নিয়ে এলো।

'আরুণি বললেন, বৎস! এই জলের উপরিভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?

'লবণাক্ত।

'এবার তলভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?

'লবণাক্ত।

'এবার মধ্যভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?

'লবণাক্ত।

'এবার জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসো—বললেন আরুণি।

'শ্বেতকেতু পিতা আরুণির কাছে এসে বসলো। আরুণি বললেন, 'শোন, লবণ জলে মিশে যাবার পরও ঐ লবণ জলের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। জলের মধ্যে লবণ থাকা সত্ত্বেও তুমি লবণ দেখতে পাওনি, তেমনি এই দেহের মধ্যে সেই সত্য, সেই ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান আছে।'

ঈশ্বর যে আমাদের দেহের মধ্যেই বিরাজিত আছেন তা জানবো কি করে? বিশ্বাস করে। বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেলেই আমাদের জ্ঞানোদয় হবে—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হবে। তখন সহজেই বুঝতে পারবো যে, ইনি আমাদের দেহের মধ্যেই বিরাজিত।

ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে হলে সর্বদা তাঁর নাম কীর্তন করতে হয়। সৎসঙ্গ করতে হয়। সাধুসন্তদের কাছে গিয়ে সদুপদেশ নিতে হয়। সংসারের কাজে রাতদিন আবদ্ধ রয়েছি বলে ঈশ্বরে মন বসতে চায় না কিছুতেই। তাই মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ধ্যান করতে হয়—তাঁর কথা চিন্তা করতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে। সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বর সৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তু আর সব অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। এইভাবে চিন্তা করতে করতেই অনিত্যবস্তু থেকে মন উঠে আসবে।'

কিন্তু শুধু ধ্যান করলেই কি হবে? চাই আত্মসংযম। মনকে খুব দৃঢ় করতে হবে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবেইতো তাঁর বংশীধ্বনি শোনা যাবে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যখন চারাগাছ থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। আবার গাছ বড় হয়ে গেলে পর তাতে হাতিও বেঁধে রাখা যায়।'

তাই সংযমের বেড়া দিয়ে আমার ভিতরের মহীরুহকে বড় করে তোলার চেষ্টা করবো—তবেই তো আমার অভীষ্টলাভে সমর্থ হবো।

আমরা সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে কত ভাবি, কত চিন্তা করি। টাকাপয়সার কথা ভাবি, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা ভাবি, ছেলে-মেয়েদের মানুষ

করার কথা ভাবি। কিন্তু তেমন করে তো ঈশ্বরের কথা ভাবি না। এ সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সরস উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে। টাকার জন্য লোকে কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে আন্তরিকভাবে কাঁদে ?'

ঈশ্বরকে ডাকার মত ডাকতে হয়। শুধু উদাহরণ দিয়েই পরমপুরুষ ক্ষান্ত হলেন না। অপূর্ব কণ্ঠে গান গেয়ে শোনালেন :

'ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

যারা সংসার ধর্ম পালন করছেন, তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন আছেন। তাদের প্রতি সংসারী লোকের একটা কর্তব্যও আছে। সেই কর্তব্যের ঠেলাতেই মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। তারা কিভাবে ঈশ্বরচিন্তা করবেন ? এ প্রশ্ন সব গৃহীর—সব সংসারী ব্যক্তির। রামকৃষ্ণদেব খুব সহজ করে বললেন, 'সংসারে সব কাজ করবে, কিন্তু মন সব সময়ে ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ-মা সবাইকে নিয়ে থাকবে ও তাদের সেবা করবে ; যেন তারা কত আপনার জন। কিন্তু মনে মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়। একমাত্র ঈশ্বরই তোমার আপনজন।' আবার উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'বড় মানুষের বাড়ি দাসী সব কাজ করে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে থাকে। সে মনিবের ছেলেদের নিজের ছেলের মত মানুষ করে, বলে, আমার রাম, আমার হরি—কিন্তু মনে মনে বেশ জানে ওরা তার কেউ নয়।'

শুধু একটি উপমাই নয়। শত সহস্র উপমা এবং উদাহরণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি কচ্ছপের কথা বলেছেন। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আড়ায়—যেখানে তার ডিমগুলো আছে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'সংসারের সব কাজ করবে, কিন্তু মন ফেলে রাখবে ঈশ্বরে।'

ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি না রেখে সংসার করতে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন রামকৃষ্ণদেব। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না রেখে সংসার করলে শুধু কলুর বলদের মত সারাজীবন ঘানিই টানতে হবে। আপদে-বিপদে শোকে-তাপে অধৈর্য হয়ে পড়বে মানুষ। ঠাকুর বললেন, 'সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না।'

বিবেক বৈরাগ্য হচ্ছে হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম হচ্ছে বিবেক। ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য। সেজন্য চাই ঈশ্বরের অনুরাগ। তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। আবার রসস্নিগ্ধ উপমা দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'হাতে তেল মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়; তা-না হলে হাতে আঠা লেগে যাবে। ভক্তিরূপ তেল মেখে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে, তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।'

প্রেম-ভক্তি না হলে ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যায় না। প্রেম ও ভক্তির অপর নাম হলো রাগভক্তি। প্রেমে এবং অনুরাগে নিজেকে রঞ্জিত করলেই ঈশ্বর আমাদের কাছে এসে ধরা দেবেন। কিন্তু আমাদের সংসার বুদ্ধি এত বেশি যে, তাঁর উপর ষোল আনা মন রাখতে পারছি না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি হচ্ছে কাঁচা ভক্তি। ষোল আনা যখন ঈশ্বরে মন থাকে, তখন সে ভক্তি হলো পাকা ভক্তি। উদাহরণ দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি লাগানো থাকলে ছবি উঠে। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়লেও সে ছবি থাকে না। একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ, তেমনি কাঁচ।'

রাগভক্তি হলে ঈশ্বরের উপর ভালবাসা জন্মে, যেমন ছেলের উপর মায়ের ভালবাসা। ঈশ্বরের উপর রাগভক্তি হলে আর স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মায়ার বন্ধন থাকে না। সংসার তখন একটা কর্মভূমি বলে বোধ হয়। রামকৃষ্ণদেব একটা অপূর্ব উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কিন্তু কোলকাতায় কর্ম করতে আসা। কোলকাতায় বাসা করে আছে কর্ম করার জন্য, কিন্তু মন সব সময়ে পড়ে থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারের প্রতি আসক্তি ধীরে ধীরে কমে আসে।'

বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। সুন্দর উপমা দিয়ে কথাটা বোঝালেন, 'দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে যায়, হাজার ঘসলেও জ্বলবে না।'

বিষয়াসক্ত মন হচ্ছে ভিজে দেশলাই। আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তাঁর আনন্দঘন মূর্তিটি দেখতে চাই। কিন্তু বিষয়াসক্ত মন নিয়ে আমি ভূমানন্দ পাবো কি করে? তাই চেষ্টার মাধ্যমে, অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে বিষয়বুদ্ধির উপরে তুলতে হবে। রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে শ্রীমতী রাধিকার কথা বললেন :

'কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী শ্রীমতী রাধিকা বললেন, ওগো, আমি সব কৃষ্ণময় দেখছি।'

'সখীরা বললো, কই আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বকছো?

'শ্রীমতী বললেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চোখে মাখো, তবেই তাঁকে দেখতে পাবে।'

চিত্তশুদ্ধি না হলে আমরা ঈশ্বর দর্শন করবো কিরূপে? তাই আগে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে মাখতে হবে। মনে ময়লা থাকলে তাঁকে দেখা যায় না। রামকৃষ্ণদেব একটি আশ্চর্য উপমা দিয়ে বললেন, 'সূচ যদি কাদা দিয়ে ঢাকা থাকে, তবে চুম্বকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তবে চুম্বকে টানে।'

মনের ময়লা চোখের জলে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। তবেই তো ঈশ্বররূপী চুম্বক আমাদের আকর্ষণ করবে। আবার পরমপুরুষের মনোরম উপমা। তিনি বললেন, 'মাটির দেয়ালে পেরেক পুঁততে গেলে অসুবিধাই হয় না। কিন্তু পাথরের দেয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তবুও দেয়ালে পেরেক পোঁতা যাবে না।'

আমিও হবো মাটির দেয়ালের মত নরম আর সহনশীল।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা যায় না।' তেমনি জীবে কামকাঞ্চনরূপ তেল লাগলে তাতে আর সাধনা চলে না। কিন্তু তেল মাখা কাগজে খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে লেখা যায়। জীবে কামকাঞ্চনরূপ তেল লাগলে ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে তবে সাধন হয়। সংসারে প্রতিনিয়ত আমরা মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ হচ্ছি। মায়ার বন্ধন থেকে গ্রন্থি মোচনের নামই ত্যাগ। সেই ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবো আমরা।

সাধুসঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন। রামকৃষ্ণদেব রসাত্মক ভঙ্গীতে বললেন, 'সাধুসঙ্গ কেমন জানো? যেমন চাল ধোয়ানি জল। সৎ কথা শুনতে শুনতে বিষয় বাসনা একটু একটু করে কমে যায়। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চাল ধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়। তাহলেই নেশা ছুটে যায়।'

সাধুসঙ্গ হচ্ছে যেন চাল ধোয়ানি জল। সাধুসঙ্গে বিষয় বাসনার নেশা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

ঈশ্বরের শক্তিতেই আমরা সবাই শক্তিমান। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছাড়া কেউই নিজের শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। একটি বিস্ময়কর উপমা গেঁথে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'একটা হাঁড়িতে করে আলু-পটল উচ্ছে ভাতে দিয়ে উনুনে চড়িয়েছ। যখন ভাত ফুটতে আরম্ভ করেছে তখন আলু পটলগুলো লাফাচ্ছে; ছেলেরা ভাবে,

এগুলো বুঝি জীবন্ত। কিন্তু জ্ঞানী লোক বুঝিয়ে দেন যে, এগুলো নিজেরা লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নীচে আগুন রয়েছে বলেই এগুলো লাফাচ্ছে। আগুন টেনে নিলে আর লাফাবে না।'

তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলো হচ্ছে আলু, উচ্ছে, পটল ইত্যাদি। 'অহং' বোধ হচ্ছে আমাদের অভিমান। ভাবছি, নিজেই টগবগ করছি নিজের জোরে। কিন্তু সচ্চিদানন্দরূপ অগ্নি যে আমাদের লাফাতে সাহায্য করছে সেটা আমরা একবারও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি না।

একটু ঐশ্বর্য হলো, কিংবা একটু ক্ষমতালাভ করলুম, অমনি আমরা ভাবতে আরম্ভ করি যে, আমি কতই না শক্তিশালী। কিন্তু দু'দিনেই যে সে শক্তি ধুয়ে মুছে যেতে পারে সে চিন্তা আমরা করছি কই? আমার যেটুকু কৃতিত্ব তা ঈশ্বরেরই বিকাশ।

॥ বাইশ ॥

'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।' আমার যা ভাল কাজ সব উনিই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু আমি বিষয়াসক্ত হয়ে যে সমস্ত পাপাচরণ করছি, অন্যায় কাজ করছি—সেগুলোর দায়-দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিতে চাই কোন মুখে? আমার পাপের ফলভোগ আমাকেই করতে হবে।

এক গল্পে আছে 'এক ব্রাহ্মণ খুব যত্ন করে একটা বাগান করেছিল। ফুলে-ফলে এবং নানা ধরনের গাছপালায় বাগানটি ছিল সুশোভিত।

'সেই সুন্দর বাগানে একদিন একটা গরু ঢুকে গাছ-গাছড়া সব খেতে আরম্ভ করলে ব্রাহ্মণ একটা লাঠি দিয়ে গরুটাকে পেটাতে পেটাতে মেরেই ফেললো।

'ব্রাহ্মণ তখন গো-হত্যার পাপ কিভাবে এড়ানো যায় তা চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো যে, বেদান্তে আছে—চোখের কর্তা সূর্য, কানের কর্তা পবন আর হাতের কর্তা ইন্দ্র। ইন্দ্রের শক্তিতে ব্রাহ্মণের হাত চালিত হয়েছে, সুতরাং গো-হত্যার জন্য ব্রাহ্মণ মনে মনে ইন্দ্রকেই দায়ী করলো। পাপ ব্রাহ্মণের মনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

'ব্রাহ্মণের মনের কথা জানতে পেরে পাপ গিয়ে ধরলো ইন্দ্রকে। এই অদ্ভুত

কথা শুনে ইন্দ্র তো আকাশ থেকে পড়লো। ইন্দ্র পাপকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললো।

'মানুষের রূপ ধরে ইন্দ্র এলো সেই বাগানে। ব্রাহ্মণকে দেখে ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মশাই, বলতে পারেন এই সুন্দর বাগানটা কার?

'ব্রাহ্মণ খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে বললো, আজ্ঞে, বাগানটি আমারই। আসুন না, একটু ভাল করে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই।

'ইন্দ্র বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো আর ব্রাহ্মণের সৌন্দর্যানুভূতির খুব প্রশংসা করতে লাগলো।

'ধীরে ধীরে মরা গরুটার কাছে এগিয়ে যেতেই ইন্দ্র অবাক হয়ে বললো, আরে রাম! রাম! একি কাণ্ড! এখানে গো-হত্যা করলো কে?

'ব্রাহ্মণ তখন মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। এতক্ষণ নিজের বাগানের খুব বাহাদুরি করছিলো—এখন মাথা চুলকাতে লাগলো।

'ইন্দ্র তখন নিজ মূর্তি ধারণ করে ব্রাহ্মণকে বললো, তবে রে ভণ্ড! বাগানের যা কিছু ভাল সব তুমি করেছ, আর গো-হত্যাটি করেছে ইন্দ্র! বটে? নে তোর গো-হত্যার পাপ।

'আর যায় কোথায়? পাপ এসে ঢুকে পড়ল ব্রাহ্মণের শরীরে।'

'আমি যা করি সব ইনিই করেন'—এই বলে নিজের দোষ-ত্রুটি সব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করি। এইভাবে আমরা নিজেদের প্রতারিত করে চলেছি। ভাল কাজের জন্য আমি প্রশংসা চাই আর মন্দ কাজের জন্য ঈশ্বরের উপর দোষ চাপাতে চাই—এটি চলে না। ভাল-মন্দ সব কিছুই তাঁকে অর্পণ করে ভাল-মন্দের ওপারে চলে যেতে হবে।

ঈশ্বরকে তো এত ডাকছি তবু তিনি শুনছেন কই? রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'তিনি খুব কানখড়কে। সবই শুনতে পান। যখন যত ডেকেছো সবই তিনি শুনেছেন। তাঁকে ডাকবার আগেই এগিয়ে আসেন তিনি। মানুষ যদি এক পা এগোয়, তিনি দশপা বাড়ান। তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই।' আবার একটি সরস কথার নক্‌শা এঁকে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'এক মুসলমান নমাজ করতে করতে 'হো আল্লা, হো আল্লা' বলে চীৎকার করছিলো। একজন তার চীৎকার শুনে বললো, "তুমি আল্লাকে এত চীৎকার করে ডাকছো কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর ধ্বনিও শুনতে পান।"

আমার মনের অবরুদ্ধ কান্না তাঁকেই শোনাব। তিনি কান পেতে সব শুনুন।

তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতেই এই সার্থক মানব জন্মলাভ করেছি। দুঃখ বেদনা যা পাই তাঁর ইচ্ছাতেই মহত্তর আনন্দলাভের জন্য। তাইতো কবি বলেছেন :

'দুঃখের বেশে এসেছো বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।'

কোনরকম পাপাচরণ না করেও যদি পাপাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হই—তাও তাঁর ইচ্ছাতেই। যদি সে দায় থেকে মুক্ত হতে পারি তবে তাও তাঁরই ইচ্ছাতেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এ সম্পর্কে মনোরম একটি গল্প বললেন :

'কোন গ্রামে এক তাঁতী ছিল। সে বড় ধার্মিক। সবাই তাকে বিশ্বাস করতো আর ভালবাসতো। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রি করতো। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলতো, 'রামের ইচ্ছা, মেহনতের দাম চারি আনা; রামের ইচ্ছা, সুতোর দাম এক টাকা। রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা; রামের ইচ্ছা, কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা।

'তার উপর লোকের এত বিশ্বাস ছিল যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় কিনে নিতো।

'লোকটি ভারী ভক্ত ছিল! রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করতো আর তাঁর নামগুণকীর্তন করতো।

'একদিন অনেক রাত্রি হয়েছে, লোকটির ঘুম আসছিলো না। বসেছিল। আর এক একবার উঠে গিয়ে তামাক খাচ্ছিলো। সেই সময়ে সেপথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছিলো। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বললো, 'আয় আমাদের সঙ্গে' এই বলে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

'এরপর এক গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে ডাকতরা ডাকাতি করলো। ডাকাতরা কতকগুলো জিনিস তাঁতীর মাথায় চাপিয়ে দিল। এমন সময় সেখানে পুলিস এসে পড়লো। ডাকাতরা পালিয়ে গেল। কেবল তাঁতীটি মাথায় মোটশুদ্ধ ধরা পড়লো। সে রাত্রিতে তাকে হাজতে রাখা হলো। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক সব জানতে পেরে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারা সবাই বললো, হুজুর! এ লোক কখনো ডাকাতি করতে পারে না।

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমার কি হয়েছিল বলতো।

'তাঁতী বললো, হুজুর রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর

রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসেছিলুম। রামের ইচ্ছা, অনেক চিন্তা করতে লাগলুম। এমন সময়ে, রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। রামের ইচ্ছা, তারা আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করলো। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় বোঝা চাপিয়ে দিলো। এমন সময়, রামের ইচ্ছা, পুলিস এসে পড়লো। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। রামের ইচ্ছা, পুলিসের লোকেরা আমাকে হাজতে দিল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এলুম।'

'এমন ধার্মিক লোক দেখে জজ সাহেব তাঁতীকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বললো, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিলো।'

তাই বলি, সংসারে এসেছি তাঁর ইচ্ছাতেই। তাঁর উপর নির্ভর করেই আমার কর্তব্য কাজ করে যাবো। আমার সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতিতে। শরণাগতিরও এক গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব অপূর্ব ভঙ্গীতে।

'বনে ভ্রমণ করতে করতে পম্পা সরোবরের ধারে চলে এসেছে রাম লক্ষণ। স্নান করতে নামবে, লক্ষণ সরোবরের তীরে মাটিতে তার তীরটি পুঁতে রাখলো। স্নানের পর উঠে এসে লক্ষণ তীরটি তুলে দেখে যে, তীরটি রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি?

'রাম বললো, ভাই, দেখ দেখ, কোন জীব হিংসা হয়ে গেল বোধ হয়।

'লক্ষণ মাটি খুঁড়ে দেখলো মস্ত একটা কোলা ব্যাঙ। একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা! রাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে ব্যাঙকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি শব্দ করলে না কেন? শব্দ করলে আমরা তো বুঝতে পারতাম, তাহলে হয়তো তোমার এমন দশা হতো না। যখন সাপে ধরে তখন তো তোমরা খুব চেঁচাও।

'ব্যাঙ বললো, রাম, যখন সাপে ধরে, তখন 'রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো' বলে চেঁচাই। এখন দেখছি স্বয়ং রামানুজই আমাকে মারছেন। তাই চুপ করে আছি।'

যদি তোমার কৃপালাভ করতে পারি আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, তাইতো হবে আমার কাছে পরমতম আনন্দ। আমার দুঃখের মধ্য দিয়েই তোমার মৃদুমন্দ বাতাস অনুভব করবো।

তাঁকে জানতে হলে তার কথা চিন্তা করতে হয়; নির্জনে বসে তাঁর নামকীর্তন করতে হয়। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'মাখন তুলতে হলে নির্জনে দই পাততে হয়।

ঠেলাঠেলি করলে, নাড়াচাড়া করলে দই বসে না। তারপর আবার নির্জনে বসে মন্থন কর সেই দই। তখনই তুলতে পারবে মাখন।'

আমি যে মন্ত্র জানি না। তন্ত্র জানি না। কিভাবে তোমার আরাধনা করবো বলে দাও। আমার রয়েছে শুধু তোমার প্রতি বিশ্বাস আর তোমার প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা। শুধু এইটুকু সম্বল করে কি আমি তোমার অপার করুণালাভ করতে পারবো? রামকৃষ্ণদেব বললেন, "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। জমিদার তার জমিদারির যে-কোন জায়গাতেই থাকতে পারেন বটে, কিন্তু লোকে বলে অমুক বৈঠকখানায় তাঁর বিশেষ আনাগোনা।'

ঈশ্বরের পাদপদ্মে আমার অহর্নিশ কাতর প্রার্থনা, 'হে ঈশ্বর! আমি শুধু তোমার ভক্ত হতে চাই—আর কিছুই চাই না। মৈত্রেয়ী মমতাশূন্যের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকে যেভাবে বলেছিলেন, আমিও ঠিক সেই ভাবেই বলতে চাই, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?'—যা দিয়ে আমি অমৃতত্বলাভ করতে পারবো না, তা দিয়ে আমি কি করবো?

॥ তেইশ ॥

মাকে জানলেই আমার সব জানার অবসান হলো। তাঁকে জানলেই আমার আর জানার কি বাকি থাকে? কিন্তু আমরা মাকে না জেনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানার চেষ্টা করছি বলেই তো মায়ের রত্নহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। বিষয়টি সহজ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব এক গল্প বলে। গল্পটি এই রকম :

'কার্তিক আর গণেশ ভগবতীর কাছে বসে আছে। ভগবতী তাঁর গলার মণিময় রত্নহার দেখিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আগে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসতে পারবে, তাকেই আমি এই রত্নহার দেবো।

'কার্তিক তক্ষুণি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়লো। গণেশ মাকে খুব ভালবাসে। সে ভাবলো, 'মায়ের বাইরে আবার ব্রহ্মাণ্ড কি!' তাই সে মাকে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করে, তারপর প্রণাম করে, যেমনি বসেছিল তেমনি বসে রইলো। অনেকদিন পর কার্তিক ফিরে এলো হন্তদন্ত হয়ে। এসে অবাক হয়ে দেখলো, দাদা গণেশ দিব্যি বসে আছে রত্নহার পরে।'

আমরাও মায়ের বাইরে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে

পড়ছি। তাই কাজ কি আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানার? শুধু জানবো, মা-ই সব। তাঁকে জানাই সব জানা।

তাঁকে জানতে হলে চাই রাগভক্তি। রাগভক্তির বন্যা যেদিন আমার জীবনে নেমে আসবে সেদিন সোজা চলে যেতে পারবো তাঁর কাছে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'বাঁকা নদী দিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতে অনেক কষ্ট। কিন্তু যদি একবার বন্যা হয় তাহলে সোজা পথে অল্প সময়ের মধ্যেই চলে যেতে পারবো। তখন ডাঙাতেই এক বাঁশ জল।' আবার বাস্তবধর্মী দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, 'মাঠে ধান কাটার পর আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন যেখান দিয়ে ইচ্ছে যাওয়া যায় একটানা। যদি পায়ে জুতো থাকে, তার মানে, যদি গুরুবাক্যে বিশ্বাস আর বিবেক বৈরাগ্য থাকে, তাহলে সামান্য খোঁচা খোঁচা খড় থাকলেও কষ্ট হয় না।'

আমরা সংসারী লোক। নানারকম স্বার্থ চিন্তা নিয়েই ঈশ্বরকে ডাকি—ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলি, 'ঠাকুর, আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশ দাও। আমাকে সুখে রাখ। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যেন সুখে থাকে। স্বার্থের জন্য বড়লোকের কাছে কিছু চাইলে, বড়লোক হয়তো ছিটেফোঁটা দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে পারেন, কিন্তু এতে বড়লোকের মন পাওয়া যায় না। তাই আমি বড়লোকের দয়া-দাক্ষিণ্য চাইবো না—চাইবো শুধু তাঁর সাহচর্য। এরই নাম অহেতুকী ভক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব অহেতুকী ভক্তির এক অত্যাশ্চর্য নকশা অঙ্কন করলেন।

'মনে কর তুমি এক জ্ঞানী-গুণী বড়লোকের বাড়িতে গেছ তাঁকে দেখতে। তাঁর কাছে তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—তোমার অভিলাষ শুধু তাঁকে দেখা, এতেই তোমার তৃপ্তি—এতেই তোমার আনন্দ। তুমি এলে একদিন সেই বড়-লোকের বাড়ি—এলে তাঁর বৈঠকখানায়। তিনি তোমাকে চেনেন না। দেখা হতেই কুণ্ঠিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই মশাই? তুমি বিনীতভাবে বললে, আমার চাইবার কিছুই নেই—শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।

'এ আবার কি রকম আসা? বড়লোক কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইবে না। চোখ বাঁকা করে তোমার দিকে তাকাবেন, ভাববেন, নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তুমি চলে গেলে।

'এরপর আবার আরেকদিন গিয়েছ। কি চান মশাই? সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বড়লোক।

'কিছুই চাই না। শুধু আপনাকে একটু দেখতে এসেছি। এতেই আমার তৃপ্তি। এতেই আমার আনন্দ।

'বড়লোক দৃষ্টি কুটিল করবেন। ভাববেন, নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী শত্রু, নয়তো গুপ্তচর ; নিশ্চয়ই কোন খারাপ অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে।

'তোমার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তুমি আবার একদিন হাজির হলে সেই বড়লোকের বাড়িতে। এমনি করে কদিন পরপরই যাও, শেষকালে রোজ যেতে লাগলে।

'বড়লোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি চান মশাই ?

'কিছুই চাই না। শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি—বললে তুমি।

'এর মধ্যে বড়লোক তোমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিসন্ধি নেই জানতে পেরেছেন। বড়লোকের মন তখন টলতে লাগলো।

'একদিন তিনি তোমাকে বললেন, বসুন। শেষে একদিন কাঁধে হাত রেখে বললেন, এত দেরি করে এলে কেন ভাই! তোমাকে না দেখে আমি যে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না।'

তেমনি ঈশ্বরের বৈঠকখানাতেও আমি অহেতুকী ভক্তি নিয়েই রোজ যেতে চাইবো। আমি তাঁর প্রেমের কাঙাল। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে নেবেন বৈকি! আমি অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে থাকবো, কখন তিনি আমাকে তাঁর কোলে স্থান দেবেন।

আমি হবো খানদানি চাষা। আমি লেগে থাকবো, আঁকড়ে থাকবো যতক্ষণ না তোমার কৃপা পাই। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যারা নতুন চাষ-আবাদ করে, তাদের জমিতে ভাল ফসল না হলে তারা সে জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা তাদের জমিতে ফসল হোক আর না হোক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষ-আবাদ করেই এসেছে। তারা জানে যে, চাষ করেই খেতে হবে।'

আমিও চাষ করেই খাবো।

'এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

ঈশ্বরের কথায় আনন্দ পেলে, ঈশ্বরের চিন্তায় আনন্দ পেলে তখন সংসার আলুনি বোধ হয়। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যতক্ষণ মনুমেণ্টের নীচে থাকো, ততক্ষণ গাড়ি-ঘোড়া সাহেব-মেম এইসব দেখতে পাবে। মনুমেণ্টের উপরে

উঠলে কেবল আকাশ-সমুদ্র—সব ধুধু করছে। তখন গাড়ি-ঘোড়া বাড়ি মানুষ —এসব আর ভাল লাগে না। এসব পিঁপড়ের মত দেখায়।'

আমি সিঁড়ি ভেঙে মনুমেণ্টের উপরে উঠবো। সাধনার ভিতর দিয়ে তাঁর করুণাঘন মূর্তিটি দেখার চেষ্টা করবো। রামকৃষ্ণদেব আবার বললেন, 'সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে! কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে পদ্ম আবার বুজে যায়।' আমরা হৃদয়পদ্ম যাতে যথার্থভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেইটুকু আর্তিই তাঁর কাছে রাখব। বিষয় বাসনার মেঘ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে না পারে।

ধর্ম, দর্শন সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেছি—অনেক মত এবং পথের কথা জেনেছি। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান সম্বল করেই তো আমি অমৃত ধামে পৌঁছাতে পারবো না। চাই আমার মনে মননের চাষ। এ সম্পর্কে পরমপুরুষ রমণীয় এক চিত্র আঁকলেন।

'কুটুম্ব বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে তত্ত্ব পাঠাতে হবে। সে চিঠি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই চিঠিতে ছিল তত্ত্বের তালিকা। খোঁজ, খোঁজ কোথায় গেল সেই চিঠি। বহু খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল সেই চিঠি। কি লিখেছে তাতে? পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাবে আর একখানা রেলপেড়ে কাপড়। বাস্, জানা হয়ে গেলো সে তত্ত্ব। এবার উড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও সে চিঠি। এই চিঠির আর কোন প্রয়োজন নেই এখন। যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এতেই কি শেষ হলো? না। এখন বেরোতে হবে সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড়ে।'

চিঠি আর কিছুই নয়। শাস্ত্র পাঠ। শাস্ত্র পাঠ করে জেনে নিয়েছি পথের সন্ধান। এখন দুস্তর তপশ্চর্যার ভিতর দিয়েই তাঁকে লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

যতক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে না পারছি ততক্ষণ জানি না তিনি কেমন। তাঁকে জানার, দেখার এক অদম্য কৌতুহল। তাই আমাদের অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাঁকে জানা হয়ে গেলেই আমাদের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণদেব একটি গল্পের ভিতর দিয়ে এই তত্ত্বটিই বোঝাতে চাইলেন :

'একজন লোকের রাজাকে দেখার খুব সাধ হলো। কিন্তু কেউ তাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে সাহস করে না। শেষপর্যন্ত একজন পণ্ডিত বললো, 'আমি রাজার কাছে রোজ যাই। আমি তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারবো।'

'তারপর দু'জনে একদিন এলো রাজবাড়িতে। প্রকাণ্ড সাতমহলা রাজপ্রাসাদ। প্রথম দেউড়িতে এসে লোকটি দেখতে পেলো কি দামী পোশাক-আশাক পরে একজন লোক বসে আছেন।

'লোকটি পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই ইনি কি রাজা ?

'পণ্ডিত বললো, না, ইনি নন। আরও এগিয়ে চল।

'এবার তারা এলো দ্বিতীয় দেউড়িতে। সেখানেও সেই লোকটি দেখতে পেলো, কি সুপুরুষ একজন কি দামী পোশাক আশাক পরে বসে আছেন।

'লোকটি আবার পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই ইনিই কি রাজা ?

'পণ্ডিত বললো, না, ইনি নন। আরও এগিয়ে চল।

'এভাবে তারা এক এক দেউড়িতে আসে আর প্রত্যেকবারই লোকটি পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করে, ইনিই কি রাজা ? আর পণ্ডিতও জানিয়ে দেয় যে, ইনি রাজা নন।

'সব শেষে তারা সপ্তম দেউড়িতে এসে হাজির হলো। এবার লোকটি যাঁকে দেখতে পেলো, তাঁকে দেখে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বেরুলো না। দেখেই সে বুঝতে পারলো, ইনি রাজা। সে অবাক দৃষ্টিতে রাজার আনন্দঘন মুখটির দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা অনাবিল আনন্দে তার মন ভরে গেল।'

রাজা আর কেউ নন, স্বয়ং ঈশ্বর। দীর্ঘদিনের তপশ্চর্যার ভিতর দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। সাধনার ভিতর দিয়ে যতই মানুষের মন নিম্নভূমি থেকে উচ্চভূমিতে উঠবে ততই মানুষের সংসারের প্রতি আসক্তি কমে আসবে এবং ঈশ্বর চিন্তায় আনন্দানুভূতি হবে। বেদে উল্লেখ আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন উঠলে পর সাধক সমাধিলাভ করেন—তখন তাঁর আর কিছুই জিজ্ঞাসা থাকে না। মন যখন হৃদয়ে ওঠে, তখন মানুষ জ্যোতিদর্শন করে। ভ্রূমধ্যে মন উঠলে পর মানুষ সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করতে পারে।

দীর্ঘদিনের সাধনার ভিতর দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। যত্ন না করলে, সাধনভজন না করলে সিদ্ধি আসে না। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব রসঘন কলসীর গল্পটি বললেন।

'এক ভদ্রলোকের এক চাকর ছিল। চাকরটি ছিল খুব ফাঁকিবাজ এবং অলস। কোন কাজেই তার মন নেই। এ নিয়ে মনিবের সঙ্গে তার প্রায়ই খিটিমিটি বাধে।

'চাকরটি স্থির করলো, সে আর মনিবের কাজ করবে না। কিন্তু মনিবকে জানিয়ে কাজ ছেড়ে দিলে মনিব হয়তো সহজে ছাড়তে চাইবে না। তাই সে একটা ফন্দী আঁটলো। মনিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে একটা মাটির কলসী সাথে করে নিয়ে এলো। মনিব ভাববে, সে হয়তো জল আনতে গেছে। আর যাওয়ার পথে পুকুরে কলসীটাকে ডুবিয়ে রেখে যাবে।

'এই ভেবে সে কলসী হাতে চলেছে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো, ওহে শুনছো? সে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলো না। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখলো, মাটির কলসীটাই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে আর বলছে, ওহে শুনছো, আমি মাটির কলসী, তোমার সাথে কথা বলছি। তুমি আমাকে জলে ডুবিয়ে মারতে চাও কেন? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি? একবার ভেবে দেখো তো আমার কথাটা। আমি এখান থেকে কত দূরে মাটি হয়ে ছিলাম। কুমোর আমাকে খেত থেকে কোদাল দিয়ে কেটে তুলেছে। তারপর ঝুড়িতে করে বয়ে এনেছে। জলে ভিজিয়ে নরম করেছে। আমার গায়ে যে সব জঞ্জাল লেগে ছিল, সেগুলো পরিষ্কার করেছে। তারপর কুমোর আমাকে চাকে দিয়েছে। চাকের পাকে পাকে আমাকে বন্‌বন্ করে কত ঘুরিয়েছে। ছাঁচে ফেলে আমাকে কলসী গড়েছে। সে সময় পর্যন্ত আমি কাঁচা মাটিই ছিলাম। এরপর আমাকে রোদে শুকিয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে। এত কৃচ্ছ্রতাসাধনের পর আমি কাজের কলসী হতে পেরেছি। এখন দেখ, সবাই আমাকে কি রকম যত্ন করে। কেউ আমাকে মাথায় করে নিয়ে যায়, কেউ কাঁকালে নেয়, আবার কেউ কেউ কাঁধে করে নেয়। আমার জন্যে সবাই এখন তেষ্টার জল পায়। আমার জন্যেই সকলের প্রাণ জুড়ায়।

'এসব কথা শুনে চাকরটার মনে হলো, না। কলসীটা নষ্ট করা উচিত নয়।'

অনেক সাধনা করে তবে ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায়। সময় না হলে ঈশ্বর দর্শন করা যায় না। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ডিমের ভেতরে ছানা বড় হলেই পাখি ঠোকরায়। সময় হলেই ডিম ফুটোয় পাখি।'

পরমতম আনন্দ লাভের শুভ মুহূর্তটির জন্য আমাকে কঠোর সাধনা করে যেতে হবে। অনেক দূর এগিয়ে গেলে আমি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমার সেই শুভ লগ্নটি আসন্ন। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব বিচিত্র এক কথার নকশা বিছিয়ে ধরলেন :

'বাবু খানসামার বাড়ি যাবেন এরূপ যদি স্থির হয়, খানসামার বাড়ির অবস্থা

দেখে তা ঠিক ঠাহর করা যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাঁট-পাট দেওয়া হয়। তারপর বাবু নিজেই শতরঞ্চ, গুড়গুড়ি এসব পাঁচরকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এসব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না যে, বাবু এই এসে পড়লেন বলে।'

যাঁরা ঈশ্বরের দেউড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন অর্থাৎ যাদের মন পঞ্চম-ভূমিতে উঠে গেছে, তাদের দেখলেই চিনে নেওয়া যায়। তাঁরা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছেন, অমৃতময় ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু আলোচনায় তাদের অনীহা। তাদের চোখে মুখে এক জ্যোতির ছটা ফুটে ওঠে।

কিন্তু আমি তো অভাজন! তাঁর পদধ্বনি শুনবো বলেই তো আজীবন অপেক্ষা করে রইলাম—তবু তার নূপুর নিক্কন শুনতে পাই না কেন? সমস্ত খাটুনির মজুরি মেলে, তবে ঈশ্বরের জন্য খাটুনির মজুরি পাই না কেন?

জ্ঞানীরা বলেন—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে তাল কেটে দিয়ো না। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে অহর্নিশ তাঁর কথা চিন্তা করে যাও—তাঁর চিন্তায় তৃপ্তি লাভ কর—সুখে দুঃখে নির্বিকার থেকে তাঁরই ধ্যান কর—তবেই তো তাঁর জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অনেক করেছ—অধৈর্য হয়ো না রাত্রির শেষপ্রহরে অরুণোদয়ের আর বেশি বাকি নেই—নেচে যাও—বাজিয়ে যাও তোমার বীণা—তালমে ভঙ্ না পায়—তাল কেটে দিও না—পাবে তোমার জীবনের পরম বস্তু। তাই বলি, আবার দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন হও।

আমার আকুল কান্নাই হবে তাঁর আবাহন সংগীত।

॥ চব্বিশ ॥

ধর্মের জগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবর্তন করলেন সর্বধর্মের সমন্বয়; বললেন, 'যত মত, তত পথ।' ধর্মের জগতে এর চেয়ে সুন্দর কথা আর কে বলতে পেরেছেন? রামকৃষ্ণদেব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, যে-কোন ধর্মের ভিতর দিয়েই মুক্তিলাভ সম্ভব। তাঁর বাণী পরমতসহিষ্ণুতার বাণী। ধর্মের নামে সংকীর্ণতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই তাঁর কাছে। তাই রামকৃষ্ণদেব সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, 'সবাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। খৃস্টান, হিন্দু, মুসলমান—সবাই বলে আমার ধর্মই ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই তো ঠিক

চলছে না। তোমাকে কে বুঝতে পারে? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলেই সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছানো যায়।'

কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মের মূলকথা বিচার না করে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিন্দা করি—পারস্পরিক রেষারেষিতে লিপ্ত হই। যে-কোন ধর্মই সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্ধ্বে। একথা আমরা চিন্তা করি না বলেই তো ধর্মের নামে চলে নানা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ এবং নোংরামি। এ সম্পর্কে পরমপুরুষ বললেন, 'তোমার জিনিস আনা দরকার—তা সে কাঁটাবন দিয়ে গিয়েই হোক বা অন্যপথেই হোক তুমি যেতে পার। ধর্ম সম্পর্কেও নানা মত এবং পথ আছে। কিন্তু একবার বিভিন্ন মতের জন্য সাধু সেবাই হলো না। এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিলো। সেখানে বহু সম্প্রদায়ের সাধুরা এসে হাজির। সবাই বললো, আমাদের সম্প্রদায়ই বড়। আমাদের সেবাই আগে হোক। অমনি হৈচৈ বেঁধে গেল। কোন মীমাংসাই হলো না। শেষে সেবা না করেই সব সাধুর দল চলে গেল। তখন বেশ্যাদের ডেকে এনে সব খাওয়ানো হলো।'

আমরা বিভিন্ন পথ দিয়ে তোমার কাছে যাবো বলেই তো পথে বেরিয়েছি। কিন্তু তোমার কথা চিন্তা না করে, অন্য পথের পথিকদের দেখে ভাবছি যে, তারা আমার পথের কণ্টকস্বরূপ। অমূলক আশঙ্কায় আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি আর ধর্মের নামে ভণ্ডামি করছি। তাইতো তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে দিয়ে আমরা পারস্পরিক বিদ্বেষের আগুনে পুড়ছি। আমরা তোমার অবোধ সন্তান। তুমি আমাদের সুমতি দাও।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে কথা। তুমি বাঁধানো সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, আবার বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার।'

আমরা যে যেরকম সিঁড়ি অবলম্বন করে উপরে উঠতে চাইছি, সেই সিঁড়ি বেয়েই উপরে উঠতে পারি। মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকাচ্ছি কিংবা কয়েক সিঁড়ি নেমে যাচ্ছি বলেই তো আমাদের মতিভ্রম।

সব পথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। কিন্তু পথটাই তো আর ঈশ্বর নয়। অন্তর যদি পরিষ্কার থাকে তবে আমরা ভুল পথে রওনা হলেও ধীরে ধীরে ঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবো। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যদি কেউ আন্তরিকভাবে জগন্নাথ দর্শনে বেরোয় আর ভুল করে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে যদি উত্তর দিকে চলে যায়, তাহলে একদিন না একদিন কেউ নিশ্চয়ই বলে দেবে,

ওহে এদিকে নয়, দক্ষিণ দিকে যাও। তার জগন্নাথ দর্শন হবেই একদিন না একদিন।'

অন্য ধর্মের কুসংস্কার কিংবা ভুলভ্রান্তি নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে কিছু লাভ নেই। আমার চাই ঈশ্বরের প্রতি ব্যাকুলতা। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যদি বল ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি, তা থাকলোই বা। সব ধর্মেই কিছু না কিছু ভুলভ্রান্তি থাকে। সবাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক আছে। কিন্তু ঘড়ি কারো ঠিক চলছে না। ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। তিনি যে অন্তর্যামী। অন্তরের টান, ব্যাকুলতা—এসব তিনি দেখতে পান।'

ভক্তেরা ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকুক না কেন—সবই তিনি শুনতে পান। চাই তাঁর প্রতি ভক্তি আর ভালবাসা। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খায় এক ঘাটে, বলে জল। মুসলমানেরা আরেক ঘাটে জল খায়, বলে পানি। ইংরেজরা আরেক ঘাটে জল খায়, বলে ওয়াটার।' রামকৃষ্ণদেব আবার বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়, যেমন তোমরা কেউ গাড়ি, কেউ নৌকা, কেউ জাহাজে করে আর কেউবা পায়ে হেঁটে এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) এসেছো। যার যাতে সুবিধা, আর যার যা প্রকৃতি—সেই অনুসারেই এসেছো। উদ্দেশ্য এক। কেউ আগে এসেছো—কেউ এসেছো পরে।'

আমরাও তেমনি কেউ বা পদব্রজে, কেউ বা নৌকো করে আর কেউ বা জাহাজে করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ীই ঈশ্বর এর বিধান করে নিয়েছেন।

বিভিন্ন নদী বিভিন্ন দিক থেকে আসে কিন্তু সব নদীই গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। সমুদ্রে গিয়ে একাকার। তেমনি আমরাও একদিন বিশ্বাত্মারূপী সমুদ্রে গিয়ে পড়বো। রামকৃষ্ণদেব একটি উপমা দিয়ে বললেন, 'রাখালেরা এক এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়, কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরুই একাকার হয়ে যায় মিলে মিশে।'

জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব ভারী সুন্দর করে বললেন, 'কেবল একটা উপায়ে জাতিভেদ প্রথা দূর হতে পারে। তা হলো ভক্তি; ভক্তর কোন জাত নেই। চণ্ডালের ভক্তি হলে সে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডাল সবাইকেই কোল দিয়েছিলেন।'

সবাই ঈশ্বরের সন্তান। তাই জাতিভেদের নাম করে কাউকেই আমি দূরে

ঠেলে দিতে পারি না। আমাদের বিভিন্ন মত এবং পথ থাকলেও ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই এক।

*　　*　　*　　*　　*

এই জন্মে যদি আমার মুক্তি না হয় তবে কি আমাকে ঘুরে ফিরে আসতে হবে বার বার এই সংসারে? এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হয়। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা শুকোতে দেয়। তার ভেতর পাকা হাঁড়িও থাকে, আবার কাঁচা হাঁড়িও থাকে। কখনো গরু-টরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে দেয়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলো ঘরে আনে। ঘরে এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। যতক্ষণ না পাকা হবে, জ্ঞানলাভ না হবে, ঈশ্বর দর্শন না হবে, আবার চাকে দেবে। ঘুরে ফিরে আসতে হবে এ পৃথিবীতে।'

যারা পাপ কাজ করছেন তারা তো অনেকেই বেশ সুখেই আছেন। আমি সৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েও তার পুরস্কার পাচ্ছি কই? অভাব এবং অনটনের মধ্য দিয়েই তো আমার সংসার চলছে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'কর্মফল আছে। লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা করে। পাপ আর পারদ কেউ হজম করতে পারে না। কেউ যদি লুকিয়েও পারদ খায়, কোনোদিন না কোনোদিন গায়ে ফুটে বেরুবেই।'

রামকৃষ্ণদেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে, পরকাল আছে। তবে জ্ঞানলাভের পর আর পৃথিবীতে আসতে হয় না। জ্ঞানলাভ না করা পর্যন্ত, ভগবান প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সংসারে আসতেই হয়—এর হাত থেকে কোন অবস্থাতেই নিস্তার নেই। অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত পরকাল আছে। জ্ঞানলাভ করে ঈশ্বর দর্শন হলেই মুক্তি। তারপর আর ঘুরে ঘুরে আসতে হয় না। রামকৃষ্ণদেব একটি মনোজ্ঞ উপমা দিয়ে বললেন, 'সেদ্ধ করা ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানের আগুনে কেউ সেদ্ধ হলে তাকে দিয়ে আর সৃষ্টির কাজ চলে না। তার আর জন্ম হয় না।'

আমি যে এই পৃথিবীতে এসেছি, আমার পূর্ব জন্মের সংস্কার কি কিছু আছে আমার মধ্যে? এ সম্পর্কে ভাবগম্ভীর এক গল্প বললেন রামকৃষ্ণদেব।

'গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছে একজন। আরাধনা করছে শবের উপর বসে। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করতে পারছে না। নানারকম বিভীষিকা

দেখছে। শেষ পর্যন্ত একটি বাঘ এসে তাকে আক্রমণ করলো। আরেকজন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। সে ভাবলো, এই ফাঁকে আমি একটু শব সাধনা করে নিই।

'পূজার উপকরণ সব আগের ব্যক্তিই তৈরি করে রেখেছিল। সে গাছ থেকে নেমে আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে লাগলো। একটু জপ করতে না করতেই ভগবতী আবির্ভূতা হয়ে বললেন, প্রসন্ন হয়েছি। বর নাও।

'তখন সে লোকটি বললো, মা, একি কাণ্ড! ঐ লোকটা খেটে খুটে এত আয়োজন করে তোমার সাধন ভজন করছিলো, অথচ তোমার দয়া হলো না। আর আমি ওর আসনে বসে একটু জপ করতে না করতেই তুমি আমাকে দর্শন দিলে?'

'ভগবতী তখন হাসিমুখে বললেন, বাছা, তুমি কি জন্মান্তরের কথা কিছু জান না? তুমি কত জন্ম আমার জন্য তপস্যা করেছ, তা কি তোমার মনে নেই? এই একটু শুধু বাকি ছিল, আজ এই দণ্ডেই তা পূরণ হয়ে গেল। সেজন্য তুমি আমার দর্শন পেলে।'

তাঁকে পেতে হলে জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা চাই। আমি শুধু একাগ্রমনে ভগবতীর উপাসনাই করে যাবো।

আমার যদি পূর্ব জন্মের কোন সুকৃতি থেকে থাকে, তবে আমি সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধারও পেয়ে যেতে পারি। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব আর একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হচ্ছে! তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'কাউকে যদি তুমি কখনো বস্ত্রদান করে থাকো, তুমি তা স্মরণ করলেই তোমার লজ্জা নিবারিত হবে।

'দ্রৌপদী বললেন, হাঁ মনে পড়েছে। একদিন একজন ঋষি নদীতে স্নান করছিলেন। তখন তাঁর কৌপীন নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল। আমি নিজের শাড়ি ছিঁড়ে আধখানা তাঁকে দিয়েছিলাম!

'শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমার আর কোন ভয় নেই!'

সংস্কারের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত দিলেন রামকৃষ্ণদেব।

* * * * *

হঠযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ নানারকম ভেলকিবাজি দেখাতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই সমস্ত ভেলকিবাজির সঙ্গে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের কোন সম্পর্ক নেই বলেছেন। ভেলকিবাজিতে লোক ভোলানো যায়—কিন্তু ঈশ্বর

সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। এই সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বললেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

'এক ছিল জাদুকর। সে দারুণ ভেলকিবাজি দেখাতে পারতো। চোখের নিমেষে সে অনেক জিনিস অদৃশ্য করে ফেলতে পারতো, আবার কোথা থেকে অনেক জিনিস নিয়ে আসতে পারতো। বাজিকরের অদ্ভুত ভোজবাজি দেখে সবাই অবাক হয়ে যেতো।

'একদিন জাদুকর এক রাজাকে খেলা দেখাচ্ছিলো আর বলছিলো, লাগ্ ভেলকি লাগ। এক একটা জিনিসের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জিনিস তার সামনে এসে হাজির হতে লাগলো। জাদুকর বলতে লাগলো, লাগ্ ভেলকি লাগ্, রাজা টাকা দাও। অমনি টাকা-পয়সা পড়তে লাগলো তার সামনে।

বলতে বলতে কি কারণে হঠাৎ তার জীভটা উল্টে গেল। অনেক চেষ্টা করেও জাদুকরের জিভটা আর সোজা করা গেল না। ফলে বন্ধ হয়ে গেল তার মুখ।, সে আর কোন কথাই বলতে পারলো না।

'যারা ভোজবাজি দেখছিলো, তাদের মনে হলো যে, লোকটা মরে গেছে। তখন সবাই মিলে ইট দিয়ে একটা কবর তৈরি করে তাতে তাকে রেখে দিল।

'এভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। সবাই জাদুকরের কথা ভুলেই গেল। কবরের কথা আর কারোর মনে রইলো না।

'একদিন একটা লোক ভাঙা ইট সরাতে গিয়ে দেখে, একজন লোক সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে।

'খবর পেয়ে অনেক লোক সেখানে এসে জড়ো হলো। তারা মনে করলো, ইনি একজন মস্ত সন্ন্যাসী; সমাধি অবস্থায় আছেন।

'তারা সাধুকে ধরাধরি করে সরিয়ে নিয়ে এলো সেখান থেকে। নাড়াচাড়া করার ফলে তার উল্টানো জিভ্ হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। অমনি সে লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, লাগ্ ভেলকি লাগ্। রাজা রূপেয়া দাও।'

হঠযোগের ভেতর দিয়ে অনেক কিছু ভেল্‌কি বাজি দেখানো যায়। কিন্তু ঈশ্বর লাভ করা যায় না।

হঠযোগ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব আরও একটি বিস্ময়কর গল্প বললেন:

'এক বাপের দুটি ছেলে। বড় ছেলে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। সে হঠযোগ অভ্যাস করতো। ছোট ছেলে লেখাপড়া শিখে বিয়ে থা করে সংসার করছে। সন্ন্যাস ধর্মের একটা রীতি হলো, বারো বছর সাধন ভজন করার

পর ইচ্ছা করলে একবার দেশে যেতে পারে। তাই বারো বছর পর বড় ভাই বাড়ি এসেছে। দাদাকে দেখে ছোট ভাইয়ের কি আনন্দ। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ছোট ভাই বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, দাদা এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ালে এতে তোমার কি জ্ঞানলাভ হলো বল।'

'দাদা বললো, দেখবি? তবে আয় আমার সঙ্গে। বড় ভাই ছোট ভাইকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। মন্ত্রবলে জলের উপর দিয়ে সে অতি সহজেই পায়ে হেঁটে এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আবার এমনি করেই ফিরে এলো ওপার থেকে এপারে। তারপর গর্ব করে বললো, দেখলি, আমার কেমন ক্ষমতা হয়েছে!

'অল্প একটু হাসলো ছোট ভাই; বললো, দাদা, কি দেখলুম! আমি মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পারাপার হই। আর তুমি বারো বছর এত পরিশ্রম করে শুধু এইটুকু পেয়েছ? এই ক্ষমতার দাম আধ পয়সামাত্র।'

বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাধনা করে অষ্টসিদ্ধি লাভ করা যায়। অষ্টসিদ্ধি লাভ করলে অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন সম্ভব। এতে লোকমান্য হওয়া যায়। কিন্তু শুধু অষ্টসিদ্ধির ভিতর দিয়ে অমৃতত্বলাভ করা যায় না। এই সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি অভিনব গল্প বললেন:

'একজন যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধিলাভ করেছিলো। কাউকে যদি বলতো, 'মর'—অমনি সে মরে যেতো। আর যদি বলতো 'বাঁচ'—অমনি সে বেঁচে উঠতো। একদিন সেই যোগী দেখলো যে, একজন সাধু একমনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ওকে গিয়ে যোগী জিজ্ঞেস করলো, ওহে, হরি হরি তো অনেক করলে, বলি পেলে কিছু?

'কি আর পাবো বলুন, শুধু তাঁকেই চাই। কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। তাই তাঁর করুণা ভিক্ষা করেই আমার দিন যাচ্ছে—বললো সাধুটি।

'যোগী বললো, ওসব পণ্ডশ্রম ছাড়ো। যাতে কিছু একটা পাও তার চেষ্টা দেখ।

'সাধু জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মশাই, আপনি কি পেয়েছেন শুনি?

'যোগী বললো, শুনবে? শুনবে আর কি! তোমাকে দেখিয়েই দিই।

'কাছেই একটা হাতি বাঁধা ছিল, সেটাকে যোগী বললো, 'মর্'—অমনি হাতিটা মরে গেল। আবার মৃত হাতিটাকে লক্ষ্য করে যোগী বললো, 'বাঁচ্'—অমনি হাতিটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'যোগী বললো, দেখলে ?

'সাধুটি বললো, কি আর দেখলুম, বলুন ! হাতিটা একবার মরলো, আবার বেঁচে উঠলো। তাতে আপনার কি এসে গেল ? আপনি কি ঐ শক্তিতে নিজের জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন ?'

যা দিয়ে ঈশ্বরলাভ করা যায় না, অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, শুধু লোকমান্য হওয়া যায়—সে বিদ্যায় কি লাভ ? রামকৃষ্ণদেব আবার কি সুন্দর করে বললেন, 'নীচ বুদ্ধির লোক সিদ্ধাই চায়। যে ব্যক্তি ধনীর কাছে গিয়ে কিছু চেয়ে বসে সে আর খাতির পায় না। সে লোককে ধনী এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। চড়তে দিলেও কাছে বসায় না।'

*　　*　　*　　*　　*

ধর্মোপদেশ দেবার জন্য কিংবা লোকশিক্ষা দেবার জন্য আমাদের দেশে বিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু তাদের উপদেশ অনেকেই শুনতে চায় না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, যে উপদেশগুলো তারা দিয়ে থাকেন সেগুলি তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পালন করেন না। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'পাখোয়াজের বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনা খুব শক্ত। তেমনি শুধু লেকচারে কি হবে, তপস্যা চাই, তবে ত বোধে এসব চিন্তা আসবে।'

আপাতদৃষ্টিতে লোকশিক্ষা দেওয়া খুব সহজ কাজ মনে হলেও, কাজটা খুবই কঠিন। যার জীবনে কোন প্রকার সংযম নেই, যিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন না, শুধু-মাত্র বিদ্যার জোরে কিংবা ক্ষমতার জোরে লোকশিক্ষা দিতে চান, সে শিক্ষা স্থায়ী হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'লোকশিক্ষা দেওয়া সহজ কাজ নয়। যদি কেউ তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন আর যদি তিনি আদেশ দেন, তাহলেই হতে পারে। শঙ্করাচার্য আদেশ পেয়েছিলেন। আদেশ না পেলে তোমার কথা কে শুনবে ?'

রামকৃষ্ণদেব আবার রসাশ্রিত উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'ওদেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পুকুর পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে করে রাখতো। যারা সকালবেলা পুকুর পাড়ে বেড়াতে যেতো, তারা খুব গালাগালি দিতো। পরের দিনও ঠিক একইরকম অবস্থা। বাহ্যে করা আর বন্ধ হয় না। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালো। তারা একজন চাপরাসী পাঠিয়ে দিলো। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলো, 'এখানে বাহ্যে করিও না'—তখন সব বন্ধ হয়ে গেল।'

যিনি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন কেবলমাত্র তিনিই ধর্মীয় উপদেশ দিতে পারেন। রামকৃষ্ণদেব একটি উপমা দিয়ে বললেন, 'প্রদীপ জ্বললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না। তেমনি, যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর আর লোক ডাকতে হয় না। অমুক সময়ে 'লেকচার' হবে বলে খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর প্রতি মানুষের এমনি আকর্ষণ যে, মানুষ তাঁর কাছে আপনিই আসে। তখন বাবু, রাজা সবাই দলে দলে আসে আর বলতে থাকে, আপনি কি নেবেন? আম, সন্দেশ, টাকা-কড়ি, শাল—এই সব এনেছি। আপনি নেবেন?'

যাঁরা প্রেমী, যাঁদের জীবের প্রতি মমতা রয়েছে তাঁরা ঈশ্বর লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, আবার কেউ দশজনকে খাওয়ায়। ঝুড়ি, কোদাল পাতকুয়ো খোঁড়ার সময় আনা হয়, কেউ কাজ হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল কুয়োতেই ফেলে দেয়, কেউ আবার পরের দরকারের জন্যে তুলে রাখে।'

যিনি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন তাঁর জ্ঞান অফুরন্ত। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ওদেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আরেকজন রাশ ঠেলে দেয়। তেমনি যে আদেশ পায়, সে যখন লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা তখন পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দিতে থাকেন। জ্ঞান আর ফুরোয় না।'

যিনি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন তিনিই লোকশিক্ষা দিতে পারেন।

সীতা উদ্ধারের পর বিভীষণ লঙ্কায় রাজত্ব করতে রাজী হয়নি। রাম তাকে বললে, তুমি মূর্খদের শিক্ষা দেবার জন্য রাজত্ব কর। তা না হলে তারা বলবে, বিভীষণ রামের এত সেবা করেছে—কিন্তু তার কি লাভ হলো?

বিভীষণ রামের আদেশ পেয়েছিলেন।

যিনি সত্যি সত্যি আদেশ পেয়ে লোকশিক্ষা দিচ্ছেন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনিই আমাদের পতন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। রামকৃষ্ণদেব জোরালো একটি উপমা দিয়ে বললেন, 'বাহাদুরী কাঠ নিজে জলে ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুও তাতে চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে কাঠও ডুবে যায়, আর যে চড়ে সেও ডুবে মরে। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষা দেবার জন্যে নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'ন। সচ্চিদানন্দই গুরু।'

যিনি মোটেই ত্যাগী ন'ন তিনিও গীতার ব্যাখ্যা করেন। ত্যাগের কথা তার

কাছ থেকে কেইবা শুনবে? গীতার মর্ম বোঝাবার আগে নিজেকে ত্যাগী হতে হবে। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব একটি রসস্নিগ্ধ গল্প বললেন।

'এক রোগী এসেছিল এক কোবরেজের কাছে। ঔষধ দিয়ে কোবরেজ বললো, আর একদিন এসো, তখন পথ্যের কথা বলে দেবো।

'রোগীর বাড়ি অনেক দূরে। পথ্যের কথা জেনে নেবার জন্যে আবার তাকে আসতে হলো কোবরেজের কাছে।

'কোবরেজ বললো, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু খুব সাবধান। গুড় খাবে না মোটেই।

'রোগী চলে গেলে আরেকজন বৈদ্য বললো, ওকে এত কষ্ট দিয়ে ফের আনালে কেন? সেই দিন বলে দিলেই তো হতো।

'কোবরেজ হেসে বললো, এর মানে আছে বৈকি। সেই দিন আমার ঘরে অনেকগুলো গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলতাম, তবে রোগীর বিশ্বাস হতো না। ভাবতো, ওর ঘরে এতগুলো গুড়ের নাগরি, আর উনি কিনা আমাকে বলছেন গুড় খাবে না। তাহলে গুড় জিনিসটা নিশ্চয়ই এত খারাপ নয়। আজ আমি গুড়ের নাগরি সব লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।"

যিনি গুরু হবেন তাঁর মধ্যে যদি 'তিনি' যথার্থই প্রকাশিত হ'ন, তবে অন্যের উপরও তার প্রভাব পড়বে বৈকি। কি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'চুম্বক পাথরের টানে লোহা আপনি ছুটে আসে। লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার হয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে। একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়।"

যথার্থ গুরুকে আমাদের চিনে নিতে হবে। ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের পথে যে বাধাগুলো আছে, সেগুলো দূরীভূত করতে সাহায্য করতে পারেন একমাত্র গুরু। তিনিই সত্যিকারের পথপ্রদর্শক। উপযুক্ত গুরুর কৃপা লাভে যাতে বঞ্চিত না হই—অহর্নিশ সেই প্রার্থনাই আমাদের তাঁর কাছে।

*　　*　　*　　*　　*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অমৃতরসিক। তিনি রসস্নিগ্ধ গল্প বা কাহিনী শুনিয়েছেন প্রেম প্রস্রবনের মত অগণিত ভক্তদের। কথায় কথায় তিনি আনন্দরস পরিবেশন করেছেন। দুরূহকে করেছেন তিনি প্রাঞ্জল তাঁর অসাধারণ ধীক্ষমতায়। সামান্য গল্প এবং উপমাকে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে পরিবেশনের দক্ষতায় তিনি করে তুলেছেন অসামান্য। তাঁর অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে কত ভক্ত পেয়েছে জীবনপথের

পথনির্দেশ। রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ না হলে এমন অমৃতকথন সম্ভবপর হতো না।

রামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন জগৎটাই দেবস্থানে রূপান্তরিত হয়ে উঠুক মানুষের দেবসুলভ আচরণে এবং আত্মিক উত্তরণে। অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, সংযম এবং দুশ্চর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই এই উত্তরণ ঘটতে পারে। রামকৃষ্ণদেবের অমেয় অমৃতময় বাণী এই অভিব্যক্তিরই অপরূপ প্রকাশ। তাই তিনি অদ্বিতীয় এবং অনন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ রসামৃতে অবগাহন করে আমাদের জীবনকেও সুপবিত্র এবং মহিমান্বিত করে তোলার জন্যে যেন অনুপ্রাণিত হই।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ!